

2022

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষা, তোমার শিকড়-বাকড়ের আলো-আঁধার, প্রসঙ্গত বাংলা ভাষা

Year	2022
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 2022
DOI	10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.2
Pages	২১-৫৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ভাষা, তোমার শিকড়-বাকড়ের আলো-আঁধার, প্রসঙ্গত বাংলা ভাষা

মনিরুজ্জামান*

পূর্ব ভূমিকা

দক্ষিণএশিয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই বলা চলে আধুনিক শিক্ষার সূতিকা-গৃহ। শতবর্ষ আগে তার প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তার শতজন্মবার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

এই বিভাগের প্রথম সভাপতি আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা ভাষার প্রথম নমুনা, চর্যাপদ; পরবর্তী আর এক সভাপতি আবিষ্কার করেন চর্যাকবিদের কাল ও পরিচয় এবং বাংলা ভাষার উৎস 'গৌড়ী প্রাকৃত' ও তার অপভ্রংশের কথা। স্বাধীনতার আগে আর এক কিংবদন্তি সভাপতি বলে দিয়ে যান বাংলা ভাষার ধ্বনির মান, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণের স্বরূপ বা দিক সমূহ। তিনি গড়ে দিয়ে যান ভাষাবিজ্ঞানী এক দল ছাত্র, যাঁরা গড়েছেন ভাষাতত্ত্বের 'ঢাকা স্কুল' (ঢাকা গোষ্ঠী)। তিনিই স্বাধীনতার প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী। তিনি ছিলেন জাতির জনকের অন্যতম অনুরাগী বান্ধব ও জনক-কন্যার শিক্ষাগুরু। এই ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের কালে আমার ভাষা বিষয়ক এই সামান্য প্রবন্ধটি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাঁদের প্রতি আমার সামান্য নিবেদন ও শ্রদ্ধা-তর্পণ।

সেই সাথে বিনম্র ভক্তি-আরমানে স্মরণ করি বিভাগে আমার প্রয়াত শিক্ষকবৃন্দকে ও তাঁদের আবর্তমান উত্তর পুরুষদের উদ্দেশে জানাই সসম্মান প্রীতি ও অশেষ মঙ্গল এবং চিরপ্রতিষ্ঠা কামনা ।

ভাষার অধিপ্রসঙ্গ

ভাষা সংযোগের মাধ্যম। সংযোগেই মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটে। 'জ্ঞান আসে ভাষাকে আশ্রয় করে।' ভাষাবিহীনে তাই সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র হয় না। এ বিষয়ে

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালিদের চেয়ে ভাল কে জানে? বাংলাদেশ তো বাংলাভাষারই দান। এখানে প্রসঙ্গটা ভাষা ও সমাজের মধ্যেই রাখা আমাদের উদ্দেশ্য।

কথাগুলি নতুন করে বলতে চাইছি। সেটা আমার মতো করে। কথা হিসাবে তা একবারে নতুন নাও হতে পারে, তবে কিনা সময়টা নতুনের এবং তাতে মনোযোগ দেবারও। কারণ এ বছর যেমন জাতির জনক মুজিব জন্ম-শতবর্ষের কাল, তেমনি পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষারও জন্ম-শতবর্ষের কাল। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন সেদিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্য-ভাষা-শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করার যেমন সময় এসেছে; এই শিক্ষাতীর্থের কলা অনুষদের পক্ষে বাংলা বিভাগ তার সুযোগ গ্রহণেও এগিয়ে এসেছে। আবার বিভাগটিতো শুধু সাহিত্যেরই নয়, ভাষারও ; তাই এ উপলক্ষ্যে, ও বিভাগীয় আমন্ত্রণে এখানে ভাষার বিষয়টিকেই প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হলো।

বলে রাখা যায়, ভাষা জানা আর ভাষা বোঝা এক কথা নয়। প্রবাল দাশগুপ্ত যেমন বলেন, 'আমরা সবাই ভাষা জানি। কিন্ত সকলে ভাষা বিষয়ক কোনো চেতনায় পৌঁছাতে পারি না।' কিন্তু এই চেতনাটি কী? সেই দিকটা বোঝা এবং বোঝাবার চিন্তা সামনে রেখে এই প্রবন্ধে ভাষার মৌল ধারণায় পৌঁছার কয়েকটি সারণীমাত্র উপস্থিত করার চেষ্টা করা হবে।

এক

সমাজ ও ভাষা

১. ভাষা সংযোগের উপকরণ, সমাজের উৎস; সমাজই ভাষার কারণ। সমাজ বাড়ার সাথে গোত্র বাড়ে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গোত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। আর্য ইতিহাসে গোত্র প্রধানদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যক। গোত্রবর্ধন, অভিবাসন, জনগোষ্ঠী (উপজাতি)-সৃষ্টিতে সমাজপ্রসারেরই কথা পাই। কৃষিসভ্যতার আগে আটবী ও আরণ্যক সমাজে ব্যাধ, শিকারি, তীরন্দাজ, ফাঁদপেতে জন্তু ধরা বাগুরিক, কাকমারা লোধা প্রভৃতি যে সব জাতির কথা জানা যায়, তারা আদিতে ছিল উপজাতি। তাদের মধ্যে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ ও বেদজ্ঞ নানাজনের উপস্থিতিও ছিল। ভাষা তাদের স্থায়িত্ব, সংহতি ও চিহ্নায়ন-সূত্র। সোমলতার চাষী বেদজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদের নামানুসারে অরণ্যের নামকরণ হতো। বিশাল ভারত খণ্ডে অসংখ্য জনগোষ্ঠী এভাবে নানা সামাজিক সংগঠনে সংহত হয়ে উঠেছিল। নতুন নতুন দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণ-আশীর্বাদে নিজস্ব এলাকা বা জনপদ গড়ে ওঠে। তবে প্রশ্ন, 'এই যে ব্রাহ্মণ, যাঁরা জনগোষ্ঠী বিস্তারে তথা উপনিবেশ গড়ার মূলে ভূমিকা রেখেছেন, এঁরা কারা?' ইতিহাসানুসারে কোশল রাজ্যের শ্রাবস্তী নগর থেকে বাওয়রি নামে এক ব্রাহ্মণ দক্ষিণাপথে গিয়ে গোদাবরী তীরের অরণ্যে অশ্বক জাতিদের নিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সাক্ষ্য দেন.'দক্ষিণাপথের অরণ্যে বৈদিক উপনিবেশ স্থাপনের পথিকৃৎ হলেন বাওয়রী

নামে এক ব্রাহ্মণ।' (ঐ, ২০০৩ : ২৪) সেখান থেকেই সাতবাহন রাজাদের উত্থান। এ ভাবে তাদের মধ্যে বরাহ, কূর্ম প্রভৃতি টোটেম-ব্যবস্থা এবং তদধীন ভাষা ও উপভাষা সমেত নানা সাংস্কৃতিক সন্নিবেশও ঘটলো। তাদের ভাষায়ও যে স্বাতন্ত্রিক চিহ্ন (S/Shiboleth-ভাগ, পরে 'টীকা' দ্রষ্টব্য) ছিল না তা বলা যাবে না (নিম্নে "ভাষার নানা পরিচয়" উপশিরোনামের আলোচনাতেও তা কিছুটা বোঝা যেতে পারে)।

মাতৃনামী, কুম্ভযোনিজ ব্রাহ্মণ ও বিখ্যাত মুণি অগস্ত্য, দ্রোণাচার্য, সত্যকাম, জাবাল প্রভৃতি জন "মোটেই অবিমিশ্র 'আর্যবংশ সম্ভূত' ছিলেন না।" এবং পিতৃতান্ত্রিক আর্য ঐতিহ্যেরও বিরোধী ছিলেন এঁরা। আদি বিষ্ণু (যার নিন্দা আছে ঋকবেদে), কার্তিক (যাকে পাওয়া গেছে স্কন্দ বা আলেকজান্ডার বা সেকান্দরের লোকজ নামে) প্রভৃতিরা এক সময় যেভাবে দেব পরিচিতি পেয়েছিল, পরবর্তিতে তা ভিন্ন হয়ে পড়ে ও যজ্ঞ স্থলে উপজাতিদের পূজাদি ক্রিয়াকর্মের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়। যজ্ঞমন্ত্র ভাষারই অন্যতম আদিরূপ। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে যজ্ঞমন্ত্রের লোকজ রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি।

১.১ বিদেশিদের সমাজভুক্তকরা (ব্রাত্যকে 'ব্রাদারহুডে' আনয়ন) গোত্রবর্ধনের একটি সামাজিক বা ধর্মীয় দিক হতে পারে, তবে বিশেষত ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আদান প্রদানই সংযোগ স্থাপনের সাধারণ কিন্তু প্রধান প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে ধনী (প্রাচীন শব্দ পণি, বৌদ্ধ যুগে শ্রেষ্ঠী, কোম্পানী আমলে যেমন জগৎ শেঠ)দের ভূমিকাই থাকে প্রধান। ঋকবেদ অনুসারে পণিদের দেবতা ছিল আদি বিষ্ণু, যিনি কৌশলে ধন আহরণ করেন এবং ইন্দ্রকে হটিয়ে দেবলোকে অধিষ্ঠান লাভ করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে সম্পদ হরণ ও ক্ষমতা কুক্ষিকরণের বিনিময়ে হলেও বৃটিশরা এ ভাবেই আমাদের এই উপমহাদেশে একটা পরোক্ষ জাগরণ (রেনেসাঁস) ঘটিয়েছিল। তবে প্রাচীন বা বৃটিশ-পূর্ব কাল অবধি, বিশেষত গ্রিক বা শক, হুন, কুষাণ বিশেষত স্কন্ধকাটা কণিষ্কের (গুপ্তপূর্ব ও সমকালীন সাতবাহন রাজাদের) আমল থেকে মোগলপূর্ব ও মোগল আমল পর্যন্ত যারাই এই উপমহাদেশকে অংশতই হোক বা বৃহত্তর অঞ্চলব্যাপীই হোক, সাময়িক বা স্থায়িভাবে, করতলগত করে রেখেছিল, তারা প্রযুক্তির দিক থেকে বিশেষ উন্নত ছিল না। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, জ্যোতিষ ইত্যাদিতে তারা ছাপ রাখলেও 'আইডিয়োলজি'র দিক থেকে কোনও বিশেষ অবদান তারা রেখে যেতে পারেনি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' শীর্ষক উপন্যাসমূলক গ্রন্থে কণিষ্ক সম্পর্কে নানা ক্ষমতার উল্লেখ আছে, তা ইতিহাস সমর্থিত কিনা সেটা ভিন্ন কথা)। তবে অবশ্যই 'শক হূণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।' এই সামাজিক মিশ্রণ তথা সেসময়ে সমাজে বিদেশিদের এই 'সমাজভুক্তি'র কারণে সমাজে যে সব পরিবর্তন ঘটলো, তার মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে বিশেষ উল্লেখ্য এবং সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো – 'ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণের হাতে মানুষ হবেন' কৌটিল্যের এই উক্তি ও তার ফলদায়ক পরিণতি; শক আমলে

কায়স্থদের শকসেনা রূপে কাজ করা, কৃষিভিত্তিক সমাজে জাতিস্তর সৃষ্টি হওয়া, প্রভৃতি। [ব্রাহ্মণ ও তার সহযোগী জাতিগুলির স্থান হল উপরে, অন্য জাতিগুলির স্থান হলো তাদের নিচে। কৈবর্ত, হাড়ি, ইত্যাদি জাতি যারা চাষবাস ধরেছিল তাদের অবস্থান আরও পরে।]

জাতিপ্রথা ব্রাহ্মণ্যকৃত্য। ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্য ও সামাজিক কর্তৃত্ববাদের যুগে জাতিপ্রথায় শুধু সমাজভেদই সৃষ্টি হয়নি, ভাষাভেদও সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণ-ভাষা ও সাধারণ ভাষাই নয়, গোত্র ও জনগোষ্ঠীর ভাষায়ও পৃথকতা বা 'ভাষা-সিবোলেথ' বা বিভাজন ঘটে এভাবে। ভাষার প্রশ্নে যাবার আগে সমাজের দিকটাও বুঝে নেওয়া যাক।

১.২ রবীন্দ্রপুরস্কারে বিভূষিত শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি অধ্যাপক প্রয়াত দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০২) বিদেশিদের অধীনে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন বিষয়ে কিছু নতুন আলোচনা করেন। (দ্র. *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০৩) তিনি ইংরেজ এবং ইংরেজ-পূর্ব কালকে প্রথমে 'আইডিয়োলজি' এবং পরে 'টেকনলজি'র বিস্তার, এই দুই দিক থেকে সামাজিক উন্নয়ন তথা অগ্রগতিকে বিচার করেন। তাঁর আলোচনায় জানা যায়, ভারতের সাথে অন্যান্য বিদেশির মধ্যে মুসলমানদের সংস্পর্শটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তখন সাম্য ও মানবতার দিক থেকে সমাজ হয়েছিল যথার্থ অগ্রবর্তী। জন্ম, বৃত্তি, সামাজিক অবস্থান আর শুদ্ধতা – এই কটি উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে জাতিপ্রথা। সেখান থেকে ইসলামি সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন ছিল মুক্তির আহ্বান। কিন্তু ইংরেজ আমলেও কি জাতিপ্রথা ছিল না? আসলে বিষয়টি ছিল জীবনযাত্রায় ধর্মের নামে পরনির্ভরতার সংস্কার (যেমন বেগার ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের সেবা, ভূমিদাস-সংস্কৃতি প্রভৃতি) ও অর্থনীতির পারবশ্যতা স্বীকার। ড. চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন, 'জাতিপ্রথার আইডিয়োলজি এ-দেশের সমাজের পক্ষে এতই স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, যে-কোনও স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকেই জাতির চেহারা দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাবে। দেখলে মনে হবে, যেখানেই একাধিক গোষ্ঠীকে কাছাকাছি বসবাস করতে হচ্ছে, সেখানেই পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নিজেদের পরিচয়ের ব্যাপারে তারা যেন জাতিপ্রথার পরিচিত মডেলকেই অনুসরণ করছে। এভাবেই... বিভিন্ন সময়ে কবীরপন্থি, লিঙ্গায়েৎ, সৎনামী ইত্যাদি যে সব প্রোটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠী জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছেন, কালক্রমে তাঁরাই আবার বৃহত্তর সমাজের অন্তর্গত নতুন এক একটি জাতি হিসাবে গণ্য হয়েছেন।' (দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০৩ : ২৮ পৃ.)

মুসলিম আমলে বৈষ্ণব ও ভক্তিবাদী সন্তদের বিশেষ অবস্থান গ্রহণের কারণে ইসলামের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদান-প্রদানে ঘটে মরমি তথা সুফিবাদের প্রসার, এমনকি লৌকিক সমাজেও দেখি সত্যপিরের মতো ঐক্যধারণাজাত সহধর্মভাবের উদ্ভাবন। এটাকে একটি বিশাল সামাজিক আলোড়ন বলে আখ্যাত করেন ড. চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ভাষায়, 'পূর্ববাংলায় অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলামে এলেন।

একটি সঙ্ঘবদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ধর্ম থেকে অনুরূপ আর একটি ধর্মে উত্তরণ নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক ঘটনা ।' (ঐ, পৃ. ২৭) তিনি বলেন, ইসলাম এ দিক থেকে একটি নতুন ও 'বড় রকমের ঢেউ'। আরও বলেন, 'ইসলামের মূল কথা শুদ্ধতা এবং বহুবাদ নয়, সাম্য এবং সৌভ্রাত্র। এই ঢেউ যে ভারতবর্ষের সমাজে অনেকখানি আলোড়ন তুলেছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতিপ্রথার আইডিয়োলজি যদি গ্রামগঞ্জে বিকেন্দ্রীভূত না হত এবং মুসলমান বিজেতাদের হাতে যদি মূলগতভাবে নতুন কোনও টেকনলজি থাকত, তা হলে ইসলামের প্রভাব বোধ হয় আরও অনেক বেশি হত।'

কিন্তু আইডিয়োলজির প্রসার বাধাহীন ছিল না। সামাজিক যোগাযোগ ও অবস্থানের দিক থেকে কিছু বাধারও সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু ধর্মে 'সত্যপীরের মত দেবতা' ঢুকলেও সমাজের উপরতলায় গোঁড়ামি ছিল যথেষ্ট। 'স্মার্ত রঘুনন্দন আর দেবীবর ঘটক হলেন এই গোঁড়ামির স্থপতি।' (দী চ : ঐ, ২৭)

সেই খানে জয় হলো ইংরেজের অর্থাৎ 'আইডিয়োলজি'র ওপর 'টেকনলজি'র। তাদের হাতে জাতিপ্রথা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেও শুধু রেলগাড়ির পত্তনের ফলেই যে এ-দেশের সমাজে অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে যায়। (সেটা কার্ল মার্কস একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেন।) কিন্তু আমেরিকায় যেমন গৃহযুদ্ধের পর দাসপ্রথা গেলেও জাতিভেদ থেকে গিয়েছিল, যদিও জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন ঘটেছিল অনেক; তেমনি ইউরোপে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউশনে'র পাশাপাশি এদেশেও নানা আন্দোলন, নানা প্রকার সংশোধনী আইন প্রণীত হলেও জাতিপ্রথাকে সরানো যায়নি, স্থানভেদে কোথাও কোথাও তার অন্য দিকে কিছু মোড় নেওয়া ব্যতীত। আমরা সেখানেই এখন স্থির করে নেব আমাদের আলোচনাকে। ভাষার প্রসঙ্গটি সেখানে অনেকখানি স্পষ্ট।

১.৩ ব্রিটিশ শাসিত 'ভারতবর্ষ' নামটা এখন অপ্রচল। তার বৃহৎ অংশ 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' এবং খণ্ডিত পূর্ববর্তী 'বর্ষ' (ভূখণ্ড-অর্থে যদি গ্রহণ করা যায়) মিলে আভিধানিকভাবে হয়তো শব্দটার অর্থ-তাৎপর্য চিন্তা করা যায়। ইংরেজি 'সাবকন্টিনেন্ট'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে কথাটা ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেকে 'সাউথ এশিয়ান সাবকন্টিনেন্ট' বলেন। তবে আগের 'ইন্ডিয়া'ও এক থাকলো না। কিছু করদ রাজ্য, ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ, ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যস্ত প্রদেশ ও বিদ্যাপতির মৈথিলি বা ব্রজভাষা এবং তুলসিদাসের 'ভোজপুরি'র মত বেশ কিছু ভাষা ও বহু উপভাষা নিয়ে 'হিন্দি হৃদয়ভূমি'র দেশ হলো নব্য 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া'। তাতে সাবেক 'সেন্ট্রাল প্রভিন্স' যেমন থাকলো না, তেমনি হিন্দিভাষী পাঞ্জাব, মারাঠিভাষী বিদর্ভ, মিশ্র ভাষী পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের হলো নানা রকম রাজনৈতিক পরিণাম।

ভাষা বা মাতৃভাষার দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের আর একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জানি এখন যে ভূখণ্ডটি দক্ষিণ এশিয়া নামে অভিহিত হচ্ছে, তার কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। কিন্তু ভাষাসংশ্রয় ছিল। কিন্তু সেটা কী। বিংশ শতকের

গোড়ায় গ্রিয়ারসনের ভারতীয় ভাষা-সমীক্ষা ও ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনাগ্রন্থে ৫৭২টি ভারতীয় ভাষার(উপভাষা সহ) কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে আর সি নিগামের লোকগণনার হিসাবপত্রে (সেনসাস রিপোর্টে, ১৯৬১/১৯৭১) এই ভাষার পরিশোধিত সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় তিন হাজারের বেশি। এর মধ্যে হিন্দিভাষীর সংখ্যা ২৫.৮ কোটির অধিক (২০০১ সনের গণনায়)। এই ভাষাগত বৈচিত্র্যের ও তার জনসংখ্যার প্রসঙ্গে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানটা আগে লক্ষ করা যাক। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক ড. ডি.পি. পট্টনায়কের সূত্রে একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে চেয়েছেন, 'একটু খুঁটিয়ে দেখলে শুধু স্বতন্ত্র ভাষার মোট সংখ্যাটাই নজরে আসে তা নয়। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুল তারতম্যও চোখে পড়ে। যেমন ধরুন, ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ওই সময়ে ভারতে মোট ১৬৫২টি ভাষা প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে ৪৭১টি ছিল নিতান্তই ছোট ছোট গোষ্ঠীর ভাষা, যা কোনটাই পাঁচজনের বেশি লোকে বলতেন না।.. . তখনও পর্যন্ত পাঁচ জন বা তার চেয়েও কম লোকে বলেন এমন ভাষার মোট সংখ্যা ছিল ২০৪। এটাও মোটেই নগণ্য নয়। বলা বাহুল্য এরই মধ্যে সংবিধানে স্বীকৃত তফসিলভুক্ত তেরোটি প্রধান ভাষাও পড়বে (সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে)। আর এ দুটি বিপরীত মেরুকে বাদ দিলে অবশিষ্ট মাঝারি আয়তনের ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭৭। এদের লোকবল ছিল ৬ থেকে ৯,৯৯৯-এর মধ্যে।

এই সময় হিন্দি ভাষীর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৩.৬৩% ভাগ। যাদের অধিবাস উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশে। এর বাইরে ভোজপুরি (বিহার, উত্তরপ্রদেশ), ছত্তিশগড়ি(ঐ), মাগধি (বিহার), মৈথিলি (ঐ), মারোয়ারি (রাজস্থান), গাঢ়ওয়ালি (উত্তরপ্রদেশ), ভিলি (মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র), পাহাড়ি (হিমাচলপ্রদেশ) এবং কুমায়ুনি, বুন্দেলি, কুমালি, মাগহি, নাগপুরি, রাজস্থানি প্রভৃতি।। এর অতিরিক্ত ছিল ৪১% হিন্দির অপরাপর বৈচিত্র্যের ভাষাভাষী যাদের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪২২ মিলিয়ন। আওধি থেকে উৎপন্ন বলে হিন্দির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে আরও ৩৭ মিলিয়ন (২.৫০ মিলিয়ন অ-হিন্দি বাদ রেখেও) ভাষাভাষী । চীন রাশিয়ার চিত্র ভিন্ন হলেও (যেমন বেইজিং থেকে দক্ষিণে সাংহাই পর্যন্ত একটাই ভাষা, ইত্যাদি), ভাষাবৈচিত্র্যের দিক থেকে এক ইউরোপের সাথে এই পরিস্থিতির তুলনা সম্ভব।

১.৪ ভাষার পরিচয়

ভাষার নানা পরিচয় : বৈচিত্র্য ও প্রসার

ভাষা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা ভাষার প্রকৃতিকে নানা ভাবে বিচার করেছেন। ভাষা বিস্তার লাভ করলেই তার পরিচয়ের ভিন্নতাও ঘটে। কিন্তু এই ভিন্নতার পরিচয় যুগে যুগে এক থাকেনি, তা ভিন্নভিন্ন গোষ্ঠীতে ভিন্ন হয়েছে। গোষ্ঠীভাগ ও বর্ণ পরিচয় প্রভৃতি যেমন, তেমনি 'ভাষার উৎপত্তি'র বিষয়েও স্থিরভাবে বলার উপায় নেই।

পণ্ডিতগণ নানাভাবেই তা বিচার করেন। ফলে উৎপত্তির দিক থেকে নানাতত্ত্বের কথা (যেমন ইউনিজেনেসিস তত্ত্ব ও পলিজেনেসিস তত্ত্ব), ভাষা-বংশ শ্রেণিকরণ তত্ত্ব (জেনিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন), ভাষার রূপতাত্ত্বিক বা রূপতত্ত্বানুগত বিভাজন তত্ত্ব (মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন) প্রভৃতি। আকৃতি বা টাইপোলজির দিক থেকেও ইদানীং নানারকম আলোচনা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও কিছু অনিশ্চিত ও অশ্রেণিসমভব ভাষাও রয়েছে। ভাষাবংশগত ভাগকে পারিবারিক বর্গীকরণও বলা য়ায়। এই শেষের প্রকরণে পৃথিবীতে ৪টি ভূখণ্ডে বা মহাএলাকায় (ইউরেশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে) পৃথিবীর ভাষাসমূহ অবস্থিত। এলাকাভিত্তিক ভাষাগুলি যথাক্রমে, (১) ইন্দো-ইউরোপীয় অর্থাৎ কেলটিক, ল্যাটিন বা রোমান্স ভাষা, টিউটোনিক, বাল্টো-স্লাভিক ও ইন্দো-ঈরানীয়, উরাল-আলতায়িক, ককেশিয়ান, ফিন্নো-উগ্রিয়, তুর্ক মোঙ্গল মাঞ্চু, দ্রাবিড়, ভোট-চীন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, জাপানি-কোরিয়, চুকচি ও অন্যান্য উত্তরেসিয় ভাষা; (২) সেমেটিক, হেমেটিক, বুশম্যান, সুদান, বান্টু; (৩) মালয়-পলেনিশিয়ান; এবং (৪) অসংখ্য অমেরিকি ভাষাবর্গ (উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাবৈচিত্র্য ছাড়াও এস্কিমো, অথবাস্কন, আলগঙ্কেয়ান, পিম্যান, প্রাচীন আজটেক প্রভৃতি এবং কিছু মিশ্রভাষা ও নারীভাষা)।

ভারত উপমহাদেশে ভাষারূপ : ক. সিংহল

সকল ভাষা-ভাষীই কমবেশি ভ্রমণশীল। অতএব পরিবর্তনশীল ও যৌগিকীকৃত, তেমনি একাধিক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ভাবেও স্থিত। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আর্যভাষার একক প্রভাব ও বিস্তার ছাড়াও একাধিক ভাষা এই ভাবে উপনিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় আর্য ও অস্ট্রিক ভাষার পারস্পরিক সংযোগ যেমন উত্তরভারতখণ্ডের বৈশিষ্ট্য, তেমনি দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এলাকায় দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সংযোগ ও সহবাস ভাষা সৃষ্টি ও বিকাশের আর এক উদাহরণ। 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা 'ইন্দো-ভারতীয়' ভাষায় বিভক্ত হয়ে উত্তর ও পূর্ব ভারতে বিস্তার পেয়েছে, আবার দক্ষিণ এশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও স্থায়ী ও ডায়াস্পোরা দুই ভাবেই তার বিস্তৃতি লক্ষযোগ্য হয়েছে। এই ভাবে মায়ানমার (বার্মা), কামাতাকা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি অঞ্চলে আরিয়ো-দ্রাবিড়ের একটা রূপ বিস্তারের পরিচয় পাই। আবার মিশ্র সিংহলি এবং ডায়াস্পোরা-তামিল এবং প্রত্যাগত সিংহলি (বিশেষত উনিশ শতকের শেষভাগে মহা দুর্ভিক্ষের কালে এবং দুই মহাযুদ্ধের মাঝে ও শেষে যারা শেষ পর্যন্ত স্বদেশে ফিরে আসেন) প্রভৃতি জনরূপ ও বিবর্তিত ভাষারূপ সিংহলি জনবাসী ও ভাষাভাষীকে বহুভাষার মুখোমুখি করেছে। উত্তর শ্রীলঙ্কায় জাফনা উপভাষা ছাড়াও তামিল ও ভারত-আগতদের ('ভারত পিউপুল') ভাষার একরূপ, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপের সাগর তীরে তার স্বাঙ্গীকৃত আর এক রূপ। শ্রীলঙ্কার ভাষা বৈচিত্র্যটি মোটামুটি এই রূপ :

প্রধান ভাষা সিংহালা, শিক্ষিত ভাষা ইংরেজি, সাধারণ শ্রীলঙ্কান ইংরেজি, এথনোলগ অনুযায়ী ভেড্ডা, প্রবাসী তামিল, শ্রীলঙ্কান পর্তুগিজ ক্রেওল, ডাচমিশ্র, বাট্টিচালোয়া,

জাফনা-তামিল, রোদিয়া উপভাষা, এলু, শ্রীলঙ্কান মুক্কুবার্স, চিট্টি, শ্রীলঙ্কান চিট্টিয়াস, সিংহলী কারাভা , ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভাষা, ভারতাগতদের ভাষা, থিগালা, হেব্বার আয়েঙ্গার, কাইকাডি, মুসলিম তামিল, কামাতাকা, দুরাভা, দেমালা, সালেগামা প্রভৃতি নিচু বর্ণের ভাষা (Caste Languages), আদিবাসী মুসলিম, ভারতের গুজরাট প্রভৃতি এবং পূর্বভারত ও এশিয়ার প্রাচীন ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শতম ও কেন্তুম দুই শাখায় বিভক্ত। পরবর্তী কালে উপভাষার ধারণা এসেছে, আবার সেই ধারণাও এক থাকেনি। পশ্চিমে উপভাষার যে রূপ, বৃটিশ উপনিবেশে বিশেষত বৃটিশ ভারতে সেই রূপের সাথে তার পার্থক্য অনেক।

পৃথিবীতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর পূর্বীধারা শতম ভাষার পরবর্তী ইন্দো-ঈরানীয় রূপ ভাগ হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকভারত-উপমহাদেশে ও অভিবাসিত কিছু দেশে ভারতীয় আর্য-ভাষার স্বতন্ত্র কিছু রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই রূপগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন (১৯৬৫ : ১৬), 'আর্য (শতম) ভাষা হইতে তিনটি শাখা নির্গত হয়। একটি পাশ্চাত্য শাখা বা ঈরানিক, দ্বিতীয় মধ্যবর্তী শাখা বা দারদিক এবং তৃতীয় প্রাচ্য শাখা বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য।'... 'আমি দেখাইয়াছি যে সিংহলী ভাষা প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।' (ঐ : ৩৬ পৃ.) পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে ('অষ্টাধ্যায়ী') 'প্রাচ্যাং' ও 'উদীচ্যাং' এই ভাষা বিভেদের উল্লেখ করেছিলেন। প্রাচীন ভাষার নমুনা 'জিপসী' (ভারতের বাইরে) ভাষায় ও 'প্রাচীন সিংহলী'তে কিছুটা রক্ষিত ছিল।

খ. ভারত

সংস্কৃত ও সিন্ধি ভাষা বাদে এখানে তফসিলভুক্ত ১৫টি প্রদেশের ভাষা নিম্নরূপ :

অভীক গঙ্গোপাধ্যায় পৃথিবীর মৃত, বিপন্ন ও জীবিত ভাষার যে তালিকা দিতে চেষ্টা করেছেন তাতে ভারতের বেশ কিছু প্রাচীন ও অজ্ঞাতপ্রায় ভাষার কথাও উঠে এসেছে, যেখানে এক ভারত উপমহাদেশে (দাক্ষিণাত্য বাদে) উত্তরাপথে তার সংখ্যা ৪৫ বা ততোধিক (দ্র. '*ভাষার মৃত্যু*', ২০১২/২০১৪)। তবে তাঁর আলোচনায় বোঝানো হয়নি যেমন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদে সামাজিক ভাষার (যেমন রাজস্থানিদের মধ্যে ভাষার) পার্থক্য কিংবা নির্দেশ করা হয়নি ভাষার আন্তঃবৈশিষ্ট্যগুলিও। যেমন হিন্দুস্থানি তথা উপ-হিমালয়ি ভাষারূপ (সাব-হিমালয়ান ডায়েলেক্ট), আম্বালাভি ভাষার অক্ষরগঠন ('সিলেবিফিকেশন'), ঝোঁক ('ট্রেস') প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্যের ধারা নিয়ে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধ্বনিবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের গুরু অধ্যাপক ডানিয়েল জোন্স এক চিঠিতে চন্ডিগড়ের এক ভাষাবিশেষজ্ঞকে জানিয়েছিলেন, 'as to stress in Languages of India, I have always had the impression that Indian languages (with the possible exception of Bengali) were stressless, i.e., that no syllables are pronounced with greater force or greater muscular tension

than others.' এর ফলে নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভাষার সাধারণ বিশ্লেষণের চেয়ে সুপ্রাবৈশিষ্ট্যের ওপর আলোচনা গুরুত্ব লাভ করে। অধ্যাপক হাই (বাংলা), অধ্যাপক কে.এস.সম্পাত (পাঞ্জাবি), বিশ্বনাথ প্রসাদ (ভোজপুরি), কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে অধ্যাপক গোলক বিহারী ধল (উড়িয়া) প্রভৃতি, তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ষাটের দশকে 'ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিকস' পত্রিকায় হিন্দিবৈচিত্র্যের ভাষাগুলির অতিরিক্ত কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ভাষাগুলি নিম্নরূপ;

যেমন– আওয়াধি (ভারত, নেপাল), আনগা, ওয়াগদি, কচ্চি, কনৌজি, কাঙ্গরি, কালাশা (চিত্রলের খোয়ার ভাষার প্রতিবেশী যা আবার কিছুটা ইরানি ও কিছুটা অনার্যভাষা প্রভাবিতও), কাশ্মিরি (গঠনের দিক থেকে SVO প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও), কুমায়ুনি, কোঙকনি, কোলি, খান্দেশি, উত্তরাপথের খোয়ার, গারোয়ালি, গামিত, গিরশিয়া, গুজারি, চুরাহি, ছত্তিশগড়ি, দুবলা, দোগরি- বাগরি, নিমাডি, বানগারু, বালোচি, বাসবী, বেরিলি, বেহগলি, ব্রজ ভাষা, ভ্রাতৃ (দ্র. উর্দু-হিন্দির মতো হালবি ও ভ্রাতৃ-র পার্থক্যটা উড়িয়া মারাঠি হিন্দি-শব্দ ব্যবহারের শতকরা হারের পার্থক্য। এরা একই উৎসজাত নয়। বাস্তার ও প্রতিবেশী এলাকার ভাষা।), ভিলাই, ভিলালা, ভিলি (দক্ষিণ কংকনি ও কিছু শুদ্ধ মারাঠি বুঝলেও নাসিক জেলার বাগলান এলাকার আহিরানী, খান্দেশি প্রভৃতি আদিবাসীব্যবহৃত), ভীল (অধিক প্রাচীন মারাঠি ও হিন্দি ব্যবহার প্রবণ), ভোজপুরি (দক্ষিণ নেপাল), মাগাহি, মান্দিয়ালি, মারোয়ারি, মালওয়ি, মিনা, মৈথিলি, লাখনি, সাহারিয়া, সাদানি, হালবি (দ্র. ভ্রাতৃ) প্রভৃতি।

এখন প্রশ্ন, এই বৈচিত্র্য, অভিবাসিত ভাষারূপ বা Diaspora ও উপভাষা কি এক?

গ. পাকিস্তান

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (উর্দু) ও জনবাসীর ভাষা এক নয়। ৪টি প্রদেশের প্রধান ভাষা লাহোরি পাঞ্জাবি ও অন্যান্য (পাঞ্জাব), পাসতু (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), বেলুচ ও ব্রাহুই (বেলুচিস্তান), সিন্ধি, উর্দু, ইরানি (সিন্ধু)।

পাকিস্তানেও এর আরও কিছু রূপ পাওয়া যায় যথা, দারি, দোডি, ধাতকি, সাইনা, সাহারিয়া, সাদানি, সিরাইকি, পাশতো (আফগানিস্তান-পাকিস্তান), খোয়ার (পাকিস্তান, ভারত), কোলি (পাকিস্তান, ভারত) প্রভৃতি।

ঘ. মালদ্বীপ

সিংহলি ভাষার সংশ্লিষ্ট ভাষা Dhivehi এখানকার জাতীয় ও সরকারি ভাষা। ইংরেজি এখানকার দ্বিতীয় ভাষা। তবে দ্বীপসমূহে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার হয়।

পাকিস্তান ও ভারতের (আন্দামানসহ) বাইরে মালদ্বীপ ও অন্যত্র (লাক্ষাদ্বীপ)-এর মতো এখানেও হিন্দি এবং উর্দুরও ব্যবহার দেখা যায়।

ঙ. বাংলাদেশ

(পরে আরও দ্রষ্টব্য)।

দেশে দেশে পরিস্থিতি ভিন্ন হয় এবং সেটা সব দিক দিয়েই। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও সেই রকম। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এটাই একমাত্র একভাষী দেশ বা মনোলিঙ্গুয়াল কান্ট্রি। এদেশের ৯৮% লোকের ভাষাই বাংলা। বাকিটা বিদেশি ভাষা ও উপজাতীয়দের মাতৃভাষা।

উইকিপিডিয়া প্রদত্ত ও ২০১১-র শুমারির তথ্য অনুযায়ী এ দেশের ভাষীর জনসংখ্যা নিম্নরূপ : বাংলা ভাষী -১৪৬,৭৭৬,৯১৬; অন্যান্য ভাষীদের সংখ্যা- ২,৯৯৫,৪৪৭ (মোট= ১৪৯,৭৭২,৩৬৪)। সরকারি এবং জাতীয় ভাষা 'বাংলা'। এর প্রতিটি জেলা-উপজেলার ভাষা-উপভাষার বৈশিষ্ট্য কমবেশি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বলা হয় কোশে কোশে ভাষা। মোট ৮টি বিভাগ (+প্রস্তাবিত পদ্মা ও ময়নামতি বিভাগ)-এর ৬৪ জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় উপভাষাগুলি স্বতন্ত্রভাবে থাকলেও। এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে ঢাকাইয়া (ও কুট্টি), ময়মনসিংগ্যা, রংপুরি (ও বাহে), বরেন্দ্রি, চাটগাঁইয়া, নোয়াখাইল্যা, বরিশাল্যা, আসাঙ্গ্যা ও সিলৈট্টাই বিশেষ উল্লেখ্য। সংখ্যালঘুদের ভাষা হিসাবে উইকিপিডিয়ায় উল্লিখিত বৈচিত্র্যগুলি হচ্ছে : বিষ্ণুপুরিয়া, ঢাকাইয়া উর্দু, হাজং, তঙ্গচঙ্গঞ্যা, ওরাওঁ সাদরি, হিন্দি, খাসি, কোডা, মুন্ডারি, পনার, সাঁওতালি, বারজৈন্ত্যা, কুরুখ, সৌরিয়া, পাহারিয়া, অ'তং, চাক, চিন, আশো, ব'ম, ফালাম, হাকা, খুমি, কোচ, গারো, মেগাম, মেইতেই-মনিপুরি, ত্রিপুরি-ককবরক, মিজো, ম্রু, পাংখোয়া, রাখাইন-মারমা। উর্দুভাষী ও রোহিঙ্গ্যারা এদেশে এখন অভিবাসী। বিদেশি ভাষার মধ্যে ইংরেজি ও কিছু প্রতিবেশী দেশসমূহের (নেপাল, দক্ষিণ ও পশ্চিম) ভারত, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চিন প্রভৃতি) ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভাষা এবং আরবি-ফারসি। এ বিষয়ে মৎপ্রণীত 'উপভাষা-চর্চার ভূমিকা' (১৯৯৪) এবং 'পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা'(২০২০) দেখা যেতে পারে। ভাষার বৈচিত্র্য থেকে সমাজের ধারা ও গঠন বৈচিত্র্যও বোঝা যায়। সম্প্রতি আকাশ মিডিয়ার জনপ্রিয়তার কারণে নতুন প্রজন্ম হিন্দির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে। উর্দু প্রসঙ্গে বলা দরকার উত্তর বঙ্গের কিছু অঞ্চল (সৈয়দপুর, রংপুর, বরেন্দ্র) ও পুরনো ঢাকার সুখবাসী ও অন্যদের মাঝে উর্দু এখনও পাকিস্তানি আমলের মতোই তবে দ্বিভাষী আকারে প্রচলিত। এছাড়াও ঢাকার উর্দু কবিদের খ্যাতিও কম নয়।

১.৫ ভারত ভাগের (১৯৪৭) পর পাকিস্তান ও ভারতে পাঞ্জাব ও সিন্ধি ভাষার বিভাজন ঘটে। পশ্চিম ভারতে সিন্ধি ও পাঞ্জাবের তাই একাধিক রূপ দেখা যায়। পাকিস্তান ছাড়াও ভারতের হরিয়ানা প্রভৃতিতেও পাওয়া যায় পাঞ্জাবির আরও কিছু বৈচিত্র্য। এছাড়াও বাগরি, লোহার প্রভৃতি উপজাতিদের ভাষায় এর বৈচিত্র্য বা প্রভাব লক্ষিত হয়।

হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসাবে তার দাবি। জন সংখ্যা ও জনপদের বিস্তৃতিতেও এর ঐক্যই তার মর্যাদাবৃদ্ধির কারণ। হিন্দি রূপের নানা আঞ্চলিক ভেদ আছে, আগে কিছু বলা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান- মধ্যভারতে ভোজপুরি (পূর্নিয়া, নাগপুরি বৈচিত্র্য এবং মরিশিয়ান ভোজপুরি), আওধি, ব্রজ প্রভৃতি তার উদাহরণ। ভারতের বাইরেও আফ্রিকার কিছু অঞ্চলের হিন্দি রূপ, পাকিস্তানের হিন্দকি, নেপালের হিন্দি এবং সুরেনিম-ত্রিনিদাদে ক্যারিবিয়ান হিন্দি এবং ইন্দো-ফিজিয়ান বৈচিত্র্যসহ এই ভাষার উপরূপ কম নয়। রাজস্থানি-গুজরাটি প্রভাবিত বাউরি, ভীল প্রভৃতি জাতিদের মাঝেও এবং শুধু তাই নয়, কাশ্মিরি থেকে লাদাখি, উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন, বুন্দেল, পাঁচকুল, ছত্তিশগড়, বিহার এবং আরও নানা প্রান্তীয় অবস্থানের ভাষায় হিন্দির প্রভাব ও মিশ্রণকেও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গণনা করা যায়। মিশ্রণ, ঋণায়ন ও যোগাযোগঘটিত সংস্কৃতি-সমন্বয়ন তথা ভাষা-পরিবর্তনের সম্ভাব্য আরও যে সব কারণ যেমন affinity, contact, convergence, acculturation - প্রভৃতির কথা ভাষাবিদেরা বলে থাকেন, সে সবের জন্যও নানাভাবেই ভাষায় ভাষায় সেতু সৃষ্টি হয়। ফলত কিছু কিছু ভাষা ভিন্ন-নামেও প্রচলিত হয় – যেমন, ভিলি/ভিলবোলি, ভীম/ভীনা, বিহর/বিরহর, ব্রজভাষা/অন্তরবেদি, ভূমিজ/মুণ্ডা, ইত্যাদি। উর্দু-হিন্দির ভিন্নতা অবশ্য তদপেক্ষা ভিন্ন। উল্লেখ্য অনেকে (অধ্যাপক কেলকার তার অন্যতম) উর্দু ও হিন্দিকে মিলিয়ে এক ভাষা এবং এক নামে যেমন 'হির্দু' নামে চিহ্নিত করতে চান। উর্দু প্রধানত মুসলমানদের ভাষা। 'দখনে হিন্দি'র অন্ধ্র প্রদেশসহ ভারতে ও ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাইরে আন্দামানে, এবং আরব সাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, ফিজি প্রভৃতি অঞ্চলসমূহে এবং পাকিস্তান, সিংহল, বাংলাদেশেও মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এর ব্যবহার দেখা যায়।

একদা আসমিয়া ও উড়িষিকে বাংলার উপভাষা বলা হতো। গ্রিয়ারসনী patois-গত ধারণা থেকে চাকমা ও চট্টগ্রামির নৈকট্য ও পার্থক্যকে হকেট কথিত L-Complex তত্ত্বদ্বারা বিচার করা যাবে কিনা বিচার্য বিষয়। শাখা ভাষা, উপভাষা, স্বতন্ত্র ভাষা শব্দগুলি বাস্তবিক অস্পষ্ট। এ সব কারণে সংখ্যাগুরু ভাষা (যে অর্থে ভারতে হিন্দিকে ধরা হয়)-র সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলাও অসঙ্গত হয় কি?

দুই

ভাষার দিগন্ত, সংমিশ্রণ ও সিবোলিথ ভাষা

২.১ প্রাচ্যের ভাষা নিয়ে বর্ণনার খুঁটিনাটি কাজ থেকে শুরু করে এর শাখাপ্রশাখা ও উপভাষা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস সন্ধানের বা তুলনার কাজে যাঁরা দরোজাটা মেলে দিয়ে গেছেন, সেই ধর্মপ্রচারক, সিবিলিয়ন ও সকল বিদ্যাতীর্থের শিক্ষাপথিকদের সকলেই প্রাচ্যের না হলেও, এখানে বসেই তাঁরা তাঁদের গবেষণা সম্পূর্ণ করেছেন। ক্রমে টোল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটার সাথে আমরা বুঝলাম, 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'।

কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় প্রাচীন কাল থেকেই ভারত অনুন্নত ছিল না। বঙ্গভূমি ছিল তার অংশ। আমরা ভুলতে পারি না, মহেঞ্জেদারো প্রাচ্যের বিস্ময়। হোক তা দ্রাবিড়ি কালের বা আগে-পরের কীর্তি। পরবর্তীকাল বৈদিক আর্যদের কাল। আবেস্তার সহগ্রন্থ বেদ। বলা হয় ইরান-তুরানের আর্যরাই তার বাহক। আমরা আর্যদের রক্ত বহন করে চলেছি। তার আগে আসিরীয় (অসূর?)-হিট্টিদের সাথে ভারতীয়দের সংযোগ ঘটার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। তাদের ভাষা ছিল আক্কাদীয় সেমেটিক ঘরানার কোনও ভাষা। Unigenesis বা Poligenesis যে সূত্রগতই হোক, মূলভাষার সর্ব বিস্তারের কারণ আজ কোনও ব্যাখ্যাতেই মেলে না। মহেঞ্জোদারোর ভাষারই কি কোনও সন্ধান মিলেছে? গ্রিক-পারসিক- ভারতিক পুরাণের মধ্যে মিলগুলির কথা নিয়ে এখন মানুষ আবার ভাবছে, ভবিষ্যতে তা নিয়ে হয়তো আরও কথা হবে। পুরাণ-তৌলনে হরপ্পার সাথে হারকিলিউসের, ভীষ্মের সাথে একিলিস এবং ভীষ্ম-মাতা গঙ্গার সাথে একিলিস-জননী থেটিসের, শাক্যমুনির সাথে Skypean Sage প্রভৃতির যে সাম্য, সে কি একেবারেই গড়হেতু?

সংস্কৃত ঠিক ভারতীয় ভাষা সম্ভূত কিনা তাও তো বলা সহজ নয়। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ভারতের বাইরে পাওয়া যায়, ভারতের কোথাও নয়। তবে এই মহাবৈয়াকরণের জন্মভূমি ছিল সালাতুর (লাহোর?)। পাটলিপুত্রের রাজদরবারে তাঁর এবং তাঁর দুই গুরু উপবর্ষ ও বর্ষের সম্মানলাভের কথাও জানা গেছে। পাশ্চাত্যের সাথে ভারতীয়দের সংযোগসূত্র স্থাপিত হয় এঁদেরই সূত্রে। সেটা আজকের কথা নয়। গ্রিকরাই প্রথম সংযোগ ঘটায়। এর ফলে সেই অতীতকাল থেকেই প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের প্রতি পশ্চিমের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষা এবং পাণিনির ভাষাবিশ্লেষণ-এর গুরুত্ব সেই সূত্রেই। তবে রোমের সাথে ভারতের বাণিজ্যঘটিত সংযোগের কথা শুধু খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে বিন্ধ্যপর্বতের আশেপাশে এলাকায় (গুজরাটের বাইরেও) সাতবাহন-রাজাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালেই নয়, পরেও ঘটেছে। বিশেষত সিল্করোডের সুবাদে। সুকুমার সেন একটি পুরনো সংস্কৃত কবিতাচরণ অনুবাদ করেন, যাতে এক বঙ্গগৃহিণীর প্রশ্ন ছিল : 'হ্যাগা (ফেরিওয়ালা), রোমায় এখন রসুনের দর জান কত?' এই যোগাযোগ তাৎপর্যশূন্য মনে হয় না।

২.২ এখানে যোগাযোগের দুই দিক আমরা লক্ষ করতে পারি- এক দিকে, খোলার দিকটায়, পাই নৈকট্য ধারণ; এর তাৎপর্য 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।' সংবর্তন তার ধর্ম। সংকর্ষণ বা সাঙ্গীকরণ..(Acculturation), সমসংযোগিকরণ বা সম্মিশ্রণ (Convergence) প্রভৃতি তার প্রক্রিয়া। অন্যদিকে দেখি এর বিপরীত রূপ তথা সংঘর্ষণ। বাইবেলের জর্ডানের হাঁটুজল খাদের এপার-ওপারের ভাষা-ভাষীদের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ থেকে একে বলতে পারি 'সিবোলেথি'-ভবন। [দ্রষ্টব্য, টীকা]

'ভাষা' নিয়ে অন্যভাবে বলতে গেলে (আসলে যে বাক্যসমষ্টিই বলি বা লিখি না কেন) তা বোঝা অসম্ভব মনে হয়। এর অর্থ বোধ হয়, 'কঠিন লাগে।' প্রবাল দাশগুপ্তের তাই

প্রশ্ন, বাক্য শ্রোতার না বক্তার? তবে বাক্য যে ভাষার অঙ্গ বা উপাদান এবং মানুষও যে ভাষিক প্রাণী সে কথা তো ভুল নয়।

তিন

ভাষা সংযোগ

ভাষা যে নানা মিশ্রণের রূপ পায় এগুলিই তার কারণ। আর্যভাষার সাথে অনার্য ভাষার সংযোগে এই ভাষার বহু রূপ প্রকাশের চিত্র আমরা পাই। অনার্যভূমি বঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধের কালে আর্যঅধিকারের বাইরে ছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'অনুমান খ্রী. পূ. চতুর্থ শতকে কিংবা তাহার কিছুপূর্বে বঙ্গদেশে আর্যসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।'

এইভাবেই বাংলা ভাষারও সৃষ্টি। বাংলা ভাষার সাথে অনার্য ভাষার সংযোগই তার মূল। কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডারি প্রভৃতি এবং খাসিয়ার সাথে বাংলার সংযোগ প্রাচীন কালেই হওয়া সম্ভব; অন্ধ্র,মালতো, কুরকো, সেন আমলের কানাড়ি প্রভৃতি দ্রাবিড়দের সাথে সংযোগ এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলে মায়ানমার সূত্রে তিব্বতি-বর্মী ভাষার প্রভাব অর্বাচীন কালে হওয়াই সম্ভব। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে মুণ্ডাভাষার সাথে বাংলার মিশ্রণ ঘটেছে সব চেয়ে বেশি। কিছুটা নমুনা উপস্থিত করা যেতে পারে।

ভাষামিশ্রণের রূপ (বাংলা-সাঁওতালি) :

ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ প্রাকৃতভাষার পূর্বী-শাখায়ন (গৌড়ী প্রাকৃত) যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি আবার গৌড়ের ভাষায় কোল মুণ্ডার প্রভাবও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর্য তথা বাংলা ভাষার সাথে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার সংযোগ তত্ত্ব তাঁকে দ্রাবিড়-মিশ্রণবাদী (বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)-দের থেকে পৃথক করেছে।

উল্লেখ্য বাংলায় দ্বিবচন নেই, কিন্তু প্রাকৃত-পূর্ব কালে আর্যভাষারূপে তিন বচনেরই ব্যবহার ছিল। (দ্র. মু. শহীদুল্লাহ্‌, ১৯৬৫) মুণ্ডা-সাঁওতাল ভাষাও দ্বিবচনী ভাষা (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। বাংলার সাথে মুণ্ডাদের সংযোগ গভীর। এদুয়ের পারস্পরিক প্রভাবের বিস্তৃত বিবরণ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব তাঁর গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। (ঐ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) ঐ গ্রন্থের অন্যত্র অন্যবিধ তথ্যও পাওয়া যায়: বাংলা 'পুরুষ'-এর স্ত্রীলিঙ্গে 'স্ত্রী'ও নয়, 'মেয়ে'ও নয়; অভিধানে আছে 'নারী'। কিন্তু পুরুষ মানুষ/মেয়ে মানুষ, পুরুষ লোক/মেয়ে লোক- এবং বেটা ছেলে/ মেয়ে ছেলে এবং ছোট ছেলে/ ছোট মেয়ে, এই রূপসমূহে ভুল নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুণ্ডার সাদৃশ্য স্পষ্ট। কারক বিভক্তিতেও তাই। দ্বিস্বর ধ্বনি ও স্বরসঙ্গতির নিয়মেও মুণ্ডা ও মুণ্ডারি প্রকৃতির অনুসরণ দেখা যায়। সব চেয়ে প্রধান বিষয়টি হচ্ছে পদক্রমরীতি, শব্দ দ্বৈতের গঠন ও ব্যবহারবিধি

মুণ্ডাভাষারই অনুকৃতিপ্রায়। বাংলা সংখ্যা শব্দ 'কুড়ি' ও নির্দেশকসহ তার ব্যবহার (যেমন দুকুড়ি পাঁচটা), সাধু ক্রিয়ার সাথে প্রথম পুরুষে 'ক' অনুসর্গ ('বসিবেক'), বিশেষণ রূপে ক্রিয়ার ব্যবহার ('চেনা লোক','কষা অংক'), প্রভৃতি। শব্দকোষে গণ্ডা, পণ, চাউল, বড়শি, ডোঙ্গা, বোকা, কানা প্রভৃতি এবং অনুকার শব্দ যথা- গোলমাল, ধুমধাম, ছুরিটুরি ইত্যাদি কোল প্রভৃতি ভাষারই দান।

বাংলা ও অস্ট্রোয়েশিয়াটিক ভাষার সম্পর্ক নিয়ে উপসংহারে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র একটি মন্তব্য নিম্নরূপ :

'বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঋণ গ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিম প্রান্তেও তাহা অতিক্রম করিয়া আরও দূরবর্তী প্রাচ্যে মুণ্ডাভাষা-গোষ্ঠীর প্রচলন দেখা যায়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত খাসি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আছে। আরও পূর্বদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইয়া মোন-খ্মের, পালৌং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরি ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। মুণ্ডা ও খাসি ভাষার মত এই সকল ভাষাও অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তাহা এক কালে অস্ট্রিক ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল। ব্রহ্মদেশে ও ভারতের বাহিরে যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়া দিয়া বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিব্বতী-বর্মী ও তাই (থাই) ভাষাভাষী জনগণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাংলাদেশে এবং সম্ভবত উত্তর ভারতের অন্যত্রও অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্যভাষীদের নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অস্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের বাকভঙ্গির ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে।' (ঐ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, উপসংহার।)

খ. Bulletin of the Department of Comparative Phililogy And Linguistics :

(নিম্ন তথ্যসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সর্বপ্রথম 'বুলেটিনে' প্রকাশিত বিভাগপ্রধান অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়ের প্রবন্ধ 'Linguistic Sketch of a Santali idiolect'- এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। মন্তব্য লেখকের।)

শব্দ	**একবচন**	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**	***স্ত্রী লিঙ্গ***	**মন্তব্য**
বেল	বেলে	বেলেকিন	বেলে-ক		
ষাঁড়	সাঁর	+কিন	+ক	গই	সাধারণত প্রাণী বাচক বিশেষ্য
দারু	দারে	+-ঐ	+-ঐ		শব্দের পূর্বপদ (উপসর্গ) রূপে স্ত্রী/পুরুষ নির্দেশক শব্দ যোগে ঘটে, যথা (আঁয়িঅ +বি.পুং). এবং (এরগা+বি.স্ত্রীং.);

মানুষ	মানওয়া	+-ঐ	+-ঐ		আর আত্মীয় বাচক শব্দের
খেঁক শিয়াল	খিক্অই	+-ঐ	+-ঐ		ক্ষেত্রে (স্ত্রীং)] লিঙ্গচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
বিড়াল (হুলো)	আঁয়িঅপুসি	+-ঐ	+-ঐ	এরগাপুসি	হিন্দির প্রভাবে আ/ই
					প্রত্যয়ের ও ব্যবহার হয়;
					যেমন মামা/মামি।
মামা	মামা	+-ঐ	+-ঐ	মামি (বাং মামি	
শালা	এরেল কয়া	+ ঐ	+ঐ	এরেল কুয়ি	বাংলায়
					হুলো বিড়াল/মাদি হাতি প্রভৃতি
বর/জামাই	জামাই	+ ঐ	+ ঐ	কিমিন(বাং.কনে)	ব্যবহার সাধারণ হলেও তা
স্বামী	জাঁওয়ায়	+ ঐ	+ ঐ	বহু (হিন্দি প্রভাব)	বাংলার নিজস্ব নয়।
					ফারসি শব্দ যোগ করেও এই
					রীতির ব্যাবহার লক্ষযোগ্য।*

চার

জনসংখ্যা, জনপদ ও ভাষারূপ

৪.১ ভাষা ও জনসংখ্যা

ভাষার তাৎপর্য ইচ্ছা করলেই বেড়ে ওঠে না। ইচ্ছে করলেই যেমন বিপন্ন ভাষা ঘুরে দাঁড়ায় না বা দাঁড়াতে পারে না। ভাষাভাষীর সংখ্যা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বটে, তবে বিষয়টা প্রাকৃতিক। আবার তা শুধু ভৌগোলিক বণ্টন-নিয়মেরই বিষয় নয়, রাজনীতিরও বিষয়। ভাষা-রাজনীতি একটি জটিল বিষয়। মৃত ভাষা হিব্রু যেমন বর্তমানে ইসরাইলের রাষ্ট্রভাষা; তা এই ভাষা-বিশ্বায়নের হেজিমনি বা ডামাডোলেরই সৃষ্টি। ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদের আন্দোলন তথা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-অঞ্চলের রাজনীতিই এর জন্য দায়ী।

আর একভাবে বিশ্বের ভাষা-পরিস্থিতি বা অবস্থান লক্ষ করা যেতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর লোক সংখ্যা ৩,৮৮,০০,০০.০০০। এর ৪% মানুষ ৯৬% ভাষায় এবং ৯৪% মানুষ ৬% ভাষায় কথা বলে। এক কালে সম্ভবত ভাষার সংখ্যা ছিল ৪২,১৯২টি। পৃথিবীর ভাষা-পরিসংখ্যানের আকর গ্রন্থ এথনোলগ (Ethnologue: Languages of the World, SIL, Texas.)- এর ২০১৯ সংস্করণ অনুসারে বর্তমানে জীবিত ভাষার সংখ্যা ৭০০০-এর অধিক, (বাস্তবত ৭১৩৯ মাত্র), যা গত শতকের

---

*সাঁওতালি দুটো উপভাষার নাম এখানে উল্লেখ রাখা যায় : ১. মাহালে ২. কারমালে। সাঁওতালি ভাষা প্রথম বিদেশিদের নজরে আসে মেদিনীপুরের বালেশ্বর, জলেশ্বর, দাঁতন ও মেদিনীপুর শহরে পাদ্রী জেরেমিয়া ফিলিপস কর্তৃক মিশন স্থাপনের সময় থেকে। তিনি ১৮৪৫-এ প্রথম বাংলা অক্ষরে সাঁওতালি গান ও লোক গল্প প্রকাশ করেন। ১৮৫২-তে তিনি একটি সাঁওতালি ব্যাকরণও প্রণয়ণ করেছিলেন বাংলায় এই মেদিনীপুর থেকেই। (দ্র. অনিমেষকান্তি পাল ২০০৯: ১৩০ পৃ.) পল ওলাফ বোডিং (P.O.Boding)-দের বহু আগেই তিনি সাঁওতালদের বিষয়টি জনসমাজে নিয়ে আসেন।

শেষে ছিল ৬৯১২ থেকে ৬৭৮৪। এটা বিভিন্ন সনের গড় হিসাব। জীবিত বা ব্যবহারীদের কাছে পাওয়া ভাষা ছাড়াও কত ভাষা হারিয়ে গেছে বা লুপ্ত হয়েছে তা জানা সম্ভব হয় নি। প্রতি বছর ৩০০০ ভাষার মৃত্যু ঘটে। মার্কিন 'সামার স্কুল অফ লিংগুইস্টিকস' (SIL) নামীয় সংস্থার কথিত ভাষা জরিপ তথ্য ভাণ্ডার-এর অন্যতম সম্পাদক পল লেইস ('এথনোলগ' ১৯৯৯) আমাদের সচেতন করেন যে, আমরা কিছু হারাচ্ছি এবং হারিয়েছি। ক্লঁদে হ্যাজেজ (ফরাসি), মার্কিন ভাষাবিদ ওনার প্রমুখের আশঙ্কা যে, ২১০০ সালের মধ্যে জগতের ৯০% ভাষা দারুন সংকটাবস্থায় গিয়ে পড়বে। তার সাথে যুক্ত হয়ে যে কথাটি এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা হল, ভাষা শুধু এক সংযোগমাধ্যমই নয়, একটি রক্ষণশালাও যেখানে সংস্কৃতির সংগঠন ও তার পরিচালনসূত্রের উদ্ভাবন ও সংরক্ষণ এবং তার সজীবতা ঘটে। কোনও ভাষা অবলুপ্ত হলে তার সাথে যুক্ত সেই প্রাকৃতিক ক্রিয়া এবং শক্তিরও বিলুপ্তি ঘটে।

ভাষাসংখ্যা, শক্তিশালী ভাষা, দুর্বল ভাষা, মাতৃভাষা, বিপন্ন ভাষা, মুমূর্ষু (moribund) ভাষা, পুনঃ প্রচলিত ভাষা, প্রভৃতি নিয়ে SIL–এর Ethnologue পরিসংখ্যানটি ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নানা গবেষণায় গবেষকদের কাছে আমরা আরও নানা তথ্য পেয়েছি। তন্মধ্যে Bernard Comrie (ed. 1987), David Crystal (1997; 2000), Peter Muhlhausler(1994), Kate Hale (1998), Jean Aitchison (2001), Bradley & Bradley (2002), Jacques Maurai (2003) প্রমুখের অবদান বিশেষ উল্লেখ্য। জার্মান পণ্ডিত পিটার মূ'লহাউসলার (ঐ) যেমন পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ভাষার হানি ও 'সংখ্যাহ্রাসে'র সাথে মানবিক চিন্তার দারিদ্র্যায়নের চিন্তা করেছেন, তেমনি আবার তাঁর বিপরীত মতবাদী সমালোচক জন এডওয়ার্ডস (২০০১) 'নিউ ইকোলজি'র তত্ত্বের আলোকে ভাষার পুনঃসন্ধানে জ্ঞানবৃদ্ধিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। টেনে এনেছেন তিনি ভাষাভাষীর অতীত সংস্কৃতি ও ভূয়োদর্শনের সম্পৃক্ততাকে। মূ'লহাউসলার সরাসরি বলেতে চেয়েছেন, 'the perception that one language or a few languages would prevail, over all other languages will greatly impoverish human knowledge.' এডওয়ার্ডস প্রমুখেরা সেক্ষেত্রে এর প্রাকৃতিক ক্ষতিপূরণে বিশ্বাসী হলেও আধুনিক তাত্ত্বিকরা মধ্যবর্তী অবস্থানকে শ্রেয় মনে করেন। কারণ এটা অনস্বীকার্য যে প্রকৃতির যে কোনও প্রকাশ যা দীর্ঘদিনের অর্জন, তার বিকল্প খুবই বিরল।

৪.২ ভাষা-জনপদ ও জনসংহতি

বস্তুত ভাষাকে বুঝতে হলে ভাষা-এলাকা ও ভাষাভাষীর জনপদসৃষ্টির কথা তথা ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়; কেননা এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিসম্পৃক্ত। *The Cultural Heritage of India* (R. K. Mission Institute of Culture, Calcutta, 1958) গ্রন্থে জে. এন. বিদ্যালঙ্কার দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতে যে সব জনপদ সংহত

রূপে গড়ে উঠেছিল, তাদের প্রধান ভিত্তি ছিল 'ভাষা' (এবং তার 'উপভাষা')। তিনি কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মৎস, সুরসেন প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এ সব অঞ্চল যে যথাক্রমে বাঙ্গুর, খরিবলি, মেওয়াটি-আহিরওয়াটি-কনৌজি ভাষার প্রসূতি-স্থল হয়ে উঠেছিল এবং সুরসেন রাজ্য যে ব্রজভাষাঞ্চল রূপে খ্যাত হয়েছিল, সেখানকার জনপদ সংহতিই ছিল তার মূলে। এখনও ভাষা ও ভাষা-অঞ্চলের সম্পর্ক সেই একই ভাবেই নির্দেশিত হয়ে থাকে। কোনও বহুভাষী দেশে ঐ ভাষাভাষীদের ভেতর বা অন্তঃস্থ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের সাধারণ ভাষা গড়ে উঠলে বহুভাষা-সমন্বিত জাতি রাষ্ট্র গঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। অনেকে 'ভারতের মত বহু ভাষা সমন্বিত রাষ্ট্রে জাতি গঠনের জন্য বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ সাধনকারী একটি ভাষা' প্রয়োজন, এ কথা বলেন বটে; কিন্তু একমাত্র রাশিয়াতেই তার উদাহরণ মেলে যেখানে 'উত্তরাধিকার সূত্রে' তা গড়ে ওঠে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবহারিক তাৎপর্য লাভ করে।

জনপদ সংহতিই যেমন নির্দিষ্ট ভাষাভাষী-অঞ্চলের স্বরূপের প্রকাশ ঘটায় (যথা 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি-'), তেমনি অঞ্চলবাসীর মাঝে স্বভাষাপ্রেমেরও উৎসারণ সৃষ্টি করে। আমরা জানি মানুষ তার মাতৃভাষায় গৌরব বোধ করে। পল লেইস বলেন, ভাষা ব্যবহারের তাৎপর্য ভাষাভাষীর ভাষা-প্রেম ও আত্মপরিচয় প্রকাশের গৌরবেই ঘটে। সে গৌরব প্রতিষ্ঠা পায় যুগপৎ ভাষার উন্নয়নে জাতির সক্রিয়তা এবং সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে।

ব্যবহারিকভাবে ভাষা কখনও হীন-তাৎপর্যক বা গুরুত্বহীন মনে হতে থাকলে তখন আত্মপরিচয়ও তাৎপর্য হারায়, মূল্যহীন হয়। ভাষার সংকটাপন্নতা, বিপন্নতা, বিলুপ্তিভবন প্রভৃতির কারণে ভাষার পূর্বগুরুত্ব লুপ্ত হতে থাকে। ভাষার অবনতি রোধ সহজ নয়।

ভাষার এই তাৎপর্য বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রসঙ্গে পরে না হয় আরও কিছু কথা বলা যাবে।

৪.৩ ভাষা ও ভাষাভাষীর চিহ্ন বা পরিচায়ক কথা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের একটি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'পারস্পরিক আদান-প্রদান যোগ্য একটি সাধারণ ভাষা ব্যতিরেকে কখনও একটি জাতীয় জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে না।' এর অর্থ ভাষা ও জাতির সম্পর্ক পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। বস্তুত ভাষা একটি গোষ্ঠীর বা পূর্ণায়ত সমাজের পরিচয় বহনের প্রকৃত ও শক্তিশালী চিহ্ন। ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রাক-যান্ত্রিক থেকে যান্ত্রিক যুগে কিংবা প্রাক-সাক্ষরতা যুগ থেকে সাক্ষরতার কালে এসে যেমন পা ফেলেছে, তেমনি মার্শাল ম্যাকলুহান, পোস্টম্যান, কার্পেন্টার প্রমুখ কথিত গণমাধ্যম-ব্যবহারের একটা বিশেষ সময়কালে এসেও উত্তীর্ণ হয়েছে। এটা সভ্যতার ও আত্মপ্রকাশ-সংস্কৃতি বিকাশের একটা পরিণত

পর্যায়। বর্তমান কালকে তাই বলা হয় 'নিউ এজ মিডিয়া' (ডিজিটাল ইন্টারএক্টিভ মিডিয়া সহ)-র কাল। ইন্টারনেট, ব্লগিং, ওয়েবসাইট, ভিডিও চ্যাটিং, ভয়েস কলিং প্রভৃতি তার নমুনা। এ সব আবার মুদ্রণ ও বিদ্যুৎ-বাহিত সম্প্রচার সম্পৃক্ত। ভাষাব্যবহারের এই ক্রমোন্নতি মূলে যন্ত্রের বা প্রযুক্তিরই দান অধিক। বিশেষত অনলাইনে ব্যক্তিগত ও বহুজনীয় অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে যোগাযোগ স্থাপন সহজ করা (জুম, ডিসকর্ড, গুগুল মীটস প্রভৃতিও যেমন) এই প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুফল; তার ফলে ভাষার পরিচয়ও বর্তমানে নানা মাত্রিকতা লাভ করেছে। অবশ্য ভাষিকতার এই উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য বহুতর নয়, একটাই। অর্থাৎ আত্মপরিচয়েরই যথাপ্রকাশ ঘটানো। ভাষার মাধ্যমেই ভাষাভাষীর এই আত্মপরিচয় ঘটে বলে ব্লুমফিল্ড তাঁর 'ভাষা' গ্রন্থে ভাষাকে সমাজ-সংস্কৃতির প্রতীকরূপে গণ্য করেছিলেন। মানব গোষ্ঠীর মানসিক ও আত্মতাৎপর্যক ইতিবৃত্ত তার ভাষা ও সাহিত্যেই প্রভাসিত হয়। কিন্তু মিডিয়াবাহিত ভাষা বা ডিজিটাল ভাষা ভাষাভাষীকে নয়, তার ভাষার ব্যবহারকেই মুখ্য করে। আত্মপরিচয় ভাষার ব্যবহারিক সংস্কৃতিতে সীমিত।

৪.৪ ভাষার সংশ্রিতায়ণ (systemisation), পরাশ্রয়ণ,অভিযোজন ও অনন্যতন্ত্রতা

Language Change ভাষার সংশ্রিতায়ণেরই প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে Aitchison, Bhat, C. Jones & Ishtla Singh প্রমুখের কথাগুলি প্রথমে জেনে নেওয়া যাক।

ভাষা ও ভাষার প্রতিরূপও ভাষার বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দিতে পারে। ভাষার বৈশিষ্ট্য সংযোগের দিক থেকে এক, সেটা সমাজগত। সংযোগ বিষয়টা সংশক্তি স্থাপন ও ব্যবহারিক তাৎপর্য অর্জনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও অন্যদিক থেকে ভাষা স্বগুণসম্পন্ন। ভাষা যেমন প্রকাশ করে, তেমনি গোপনও করে।

৪.৫ ভাষা সমাজের বিষয়, ব্যক্তিরও বিষয়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে শাব্দিক উপাদান ও বাক্য-বিষয়ে চেতনাগত (স্বজ্ঞা) এবং প্রভাবগত একটা সৃজনীতৎপরতা গড়ে ওঠে। তখন পরিবেশকে অবহেলা নয়, বরং তার সহায়তা নিতে ও তাকে বুঝে নিতে বিশেষ মনোযোগেরও আবশ্যক হয়। মা তথা শিশুর প্রতিপালক যিনি ভাষারও অভিভাবক তার সহায়তায় সংযোগস্থাপনের প্রথম সোপান বা ভূমিটির পত্তন ঘটে।

আপন পরিবেশে মাতৃভাষা ও আপন সমাজ ও অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যের বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বৈরাগ্যে শব্দের যথাগঠন ও ডোমেন (বা শব্দের বিষয়গত ক্ষেত্র)-নির্বাচনে এবং বাক্যাদর্শের ধরন যথা Tokens of speech-গুলির সংগতিপূর্ণ অভিযোজনে (Adaptation) ভিন্নতা দেখা দিতে পারে; ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনভ্যস্ত ভাষারূপের প্রতিঘাতে (বা সে রকম কোনও ভিন্ন প্রতিবেশের মুখোমুখিতায়) বিরূপ-মানসিকতাও ঘটতে পারে। বিশেষত যেমনটি ঘটে দ্বিভাষিতার পরিবেশে। Peer group-এর মধ্যেও শব্দ নির্বাচনে ভিন্নতার মাঝেও

অর্থগত অভিন্নতাই পরিলক্ষিত হয়। লোকগল্পে এর ক্লাসিক উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন, "দুধ কি? না- দুগ্ধ। দুগ্ধ কেমন? না,- শাদা। শাদা কেমন? না,-বকের মত। বক কেমন? না,- হাতির শুঁড়ের মত বাঁকা। ও, তাহলে আমার আর দুধের দরকার নেই।"

৪.৬

মোট কথা, ভাষার প্রতিরূপও ভাষার বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দিতে পারে। তবে তা ভাষা-অর্জনের নিয়মিত রূপ নয়। যদিও ভাষার সেও এক সংশ্লেষ বটে; যেমন ধ্বনি বা রূপের স্বাধীন বিকার (free variation), কখনও বা ধ্বনিপরিবর্তনের (regular/ irregular sound change) এবং বাক্যের Token form বা ব্যাকরণী দ্বৈততা (ambiguities) বা (un-) grammaticalities-এর ছদ্ম প্রকাশসমূহও। ভাষার সংশ্রয়ী প্রকৃতিতে এরূপ কোনও বিশেষ বৈপরীত্যিক রূপের ধারা সংগঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। যে গোষ্ঠীর ভাষা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই পদক্রম অনুসারে গঠিত হয়, তার ব্যতিক্রম হলে সেই ভাষার নিয়মের বা শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটে। বাংলা ভাষায়, কবিতায় বিশেষত ছড়ায়, কিছু নিয়মের পরিবর্তন দেখা গেলেও তার উদাহরণ সীমিত; তাতে মূল ভাষার পরিচয়ে চির ধরে না।

৪.৭

B.N.Patnaik (I.I.T., Kanpur)-এর মতে (তাঁর উদাহরণ উড়িয়া ভাষার) শব্দকোষে ঋণগ্রহণে (শব্দদ্বৈত, ধ্বনাত্মক প্রভৃতি শব্দেও) ভাষা কাঠামোতে কোনও পরিবর্তনই অনুভূত হয় না। যেমন উড়িয়াতে 'ইনজেকশন-ফিনজেকশন', আলমিরা-ফালমিরা', 'ডাকতারঅ-ফাকতারঅ' প্রভৃতি (সহশব্দগুলি এখানে ফ-যুক্ত)। বিধেয় বিশেষণে 'সেহ বড় পরিশ্রমি অছি' স্থলে 'সে বড়ি হার্ডওয়ার্কিং-' অনায়াসেই চলতে পারে। বাক্য ব্যবহার-রীতিতেও একই নিয়মই দেখা যায়। কর্মবাচ্যে এর উদাহরণ এই রূপ, তাতে নিয়ম বা সূত্র পরিবর্তনের স্থলে সূত্রযোগের (?) অভিযোজন দেখা যায়। অর্থাৎ ভাষায় বিদেশি (এখানে ইংরেজি) নিয়ম যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মূল ভাষার গঠনে কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। পটনায়কের উদাহরণ : 'মহাভারত ব্যসদেবঙ্ক দ্বারা লেখা পাইছি।' (The Mahabharata has been composed by Vyasadeva.') ক্রিয়ার 'has been composed' রূপটি ইংরেজি passive ধরনের। বাক্যটি উড়িষ্যার বা ওড়িষি ভাষার। পাটনায়কের মন্তব্য, 'Thus we find that the rule system of a language is not affected in any significant way by borrowing.' এই নিয়ম ভারতীয় সব ভাষাতেই খাটে। একে তিনি বলেছেন, 'need based'. বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের আর একটি উদাহরণ হতে পারে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা ডোমেনে পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এখন তা সাধারণ, যেমন কমপ্লেক্স, কম্প্যুটার, কীবোর্ড, কলেজ, হেড স্যার, ক্লাসনোট, নাম্বার, রেজিস্টার, কীনোট পেপার, ব্লাডরিপোর্ট, এক্স-রে, শপিংমল, সাইনবোর্ড, মডেল, রোড, হাইওয়ে, পাম্প, ট্রাক্টার, রেল লাইন, সুপ্রিমকোর্ট,

স্যাটেলাইট, পাইপ, (এমনকি 'পাইপ লাইনও') ইত্যাদি। অনিংরেজিকরণ (de-Englishization actvity) এর বিপরীত ক্রিয়া। বিচারালয়, শল্যচিকিৎসা,স্বনিম (ফোনিম), বিশ্ববিদ্যালয় (যদিও 'ইউনিভার্সিটি'ই অধিক চালু), ইত্যাদি। রূপটি বাংলার সমজ ভাষায়। তাই বাংলাতেও এর উদাহরণ এক ঢাকাইয়া রিকসাওয়ালার গল্পে পাওয়া যায় : 'জাইবেন তো হালায় ইনিবারসিটি, বিশশোবিদ্যালয়-বিশশোবিদ্যালয় কইবার লাগচেন ক্যা?'

৪.৮

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ড. শহীদুল্লাহ্ 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'সাপেক্ষতা'র প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত নিয়মে আচার্য সুনীতিকুমার বাক্য গঠনের তিনটি শর্ত ('আকাঙ্ক্ষা', 'যোগ্যতা' ও 'আসত্তি') উল্লেখ করেন। বাক্যের উপাদান (সমূহ) যখন অর্থপূর্ণ ও শৃঙ্খলাযুক্ত পদসমষ্টি দ্বারা ভাবসঙ্গতি রক্ষা করে তখন তার মধ্যে বাক্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ ভাব বা অর্থের আকাঙ্ক্ষা মেটে, পদের বিন্যাসে একটা ব্যাকরণী বা বিধিগত গঠনরূপ গড়ে ওঠে এবং ধ্বনি, রূপ, শব্দানু, প্রত্যয়, পূর্ব, পর বা অন্ত্যপ্রকরণ-চিহ্নসমূহ (লিঙ্গ, বচন, কারকান্ত অনু শব্দ তথা বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি), শব্দরূপ, বাক্য এবং ভাষিক উপাদানের তাৎপর্য লাভ করে।

এইভাবে ধ্বনিপরিবর্তন, ধ্বনি ও শব্দ সম্প্রসার, সহায়ক শব্দরূপ-যোজন, শব্দ সংকোচন, কারক চিহ্ন ও অন্যান্য 'grammatical marker' যোগ কিংবা লোপ; অন-চিহ্ন অব্যয়ী শব্দের অতিপ্রয়োগ তথা সংযোজন প্রভৃতিও তার সেই আকরণ। সাধারণভাবে ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ভাষা পরিবর্তনের লক্ষ্যও এই চিহ্ন বা প্রতীকরূপসমূহ।

পাঁচ

'ভাষা বহতা নীর'

৫.১ ভাষা চেতনা, ভাষার বিকাশ : উন্নয়ন ও মাতৃভাষা

উনিশ শতক থেকে বাংলা ভাষা ঠিক কাদের সৃষ্টি এবং কাদের মাতৃভাষা, এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমান এবং মুসলমান-মুসলমানের মধ্যেও বিতর্ক দেখা দেয়। পরে বৌদ্ধকবি ভুসুকু যে বাঙালি এবং বাংলারই ভূমিপুত্র ছিলেন এটা জানা যায়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখের চেষ্টায় আরও জানা যায় মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয়।

পণ্ডিতজনেরাই শুধু নন, কবিজনেরাও যেমন রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'ভাষা নদীর মত', মীরার ভজন-গীতের ভাষায় 'বহতা নীর'। শব্দে, বাক্যে ও ব্যাকরণী নিয়ম কানুনে ভাষার শুধু গতানুগমনই ঘটে না, আগমনও ঘটে। ভাষার সংশ্রায়নে শক্তির সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহু রকম 'করপাস' সংযোজনে এবং বাক-প্রকরণে ভাষা শুধু ভিন্নই হয় না, উন্নয়নমুখীও হয়। শক্তিগম্যতা অর্জন করে।

উন্নয়ন-চিন্তাই উন্নয়নের লক্ষণ। ভাষার উন্নয়ন তার মধ্যে প্রধান। কোল্ড-ওয়ারের পর নব্বুইয়ের দশকে ইসলাম ও আরবীয় এবং প্রাচ্যভুবনের কথা নিয়ে আলোচনার নানা বিস্তার লক্ষ করা যায়। এইভাবে ১৯৯৭ থেকে ভাষার উন্নয়ন নিয়েও বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তার কিছু আগে থেকে এই ধারণাটিও গুরুত্ব পেতে থাকে যে, ভাষা শুধু সাম্রাজ্যবাদেরই নয়, বিশ্বায়নেরও একটি হাতিয়ার। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের 'Clash of Civilization' (1996)-এর মতো, তার পরের বছর 'ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ডেভলপমেন্ট' গ্রন্থে Kenny & Savage-এর গবেষণা ও কর্মোদ্যোগ বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IML-এর সেমিনারিয় বক্তব্যে (বিশেষভাবে ভাষাবিদ কামরুল হাসান চৌধুরীর আলোচনায়) প্রকাশ পায় যে, ইংরেজিকে 'উন্নয়নের ভাষা' মনে করার 'এক তরফা যুক্তি'টা খুব শক্তিশালী নয়। তবে কিনা বিশ্বায়নের সাথে ধারণাটি খুব প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। যদিও 'এ ব্যাপারে দলিল-দস্তাবেজ বা প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাই না।' এই নিয়ে তাঁর বক্তব্যও আছে।

এশিয়া খণ্ডে 'ভাষা-উন্নয়ন' এবং 'ভাষা-পরিকল্পনা' নিয়ে কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা-সংস্থা (সংক্ষেপে মহিশুরস্থ 'ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউট' বা CIIL)-এর কাজও এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ্য।

৫.২ ভাষার ব্যবহার

প্রধান ভাষা-অঞ্চলে অপ্রধান ভাষাভাষীর ভাষারূপ বা ভাষাব্যবহার প্রকৃতি, আধুনিক ঔপনিবেশিক অঞ্চলের ভাষার ব্যবহারিক রূপ, সাহিত্যিক ভাষার নানা প্রকরণ, স্থানিক গীতিকার ভাষা এবং লোকভাষা প্রভৃতি এর এক রূপ। তবে তা রীতিতাত্ত্বিক বা স্টাইলিস্টিকস বিজ্ঞানের বিষয়।

বাক্যে উপাত্ত-উপাদানের নানা সংযোজন-সংভুক্তিকরণে এবং উপরিতলে (ব্যবহারে) ও ব্যাকরণী প্রকরণে (বা চমস্কীয় 'গভীর তলে') সূত্রসম্পাদন, এবং ভাষার গঠন, রূপাশ্রয়, শাসন-বাঁধন বা আকর্ষণ প্রভৃতি নানা বাক-সাধন বা বাক-সংবর্তন তার শুদ্ধ বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক। প্রবাল দাশগুপ্তের বা শিশির ভট্টাচার্যের কিছু আলোচনা এখানে তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বলাবাহুল্য, ভাষার ব্যবহারিক রূপ বহু বিচিত্র।

৫.৩ ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

প্রত্যেক ভাষারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং আছে। এর দ্বারাই তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে থাকে। যেমন বাংলা ভাষায় বাক্য বলার সময় ক্রিয়া পদ শেষে বলাটাই নিয়ম। যেমন আমি ভাত খাই। ইংরেজিতে খাই কথাটা কিন্তু শেষে বলা হয় না, মাঝে বলা

হয়। এ জন্য বাংলাকে S O V এবং ইংরেজিকে S V O ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাংলা হচ্ছে 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া' এই নিয়মের ভাষা এবং ইংরেজি হচ্ছে 'কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম' এই নিয়মে বাক্য বলার ভাষা। এইভাবে আবার ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণী পরিভাষার অনুবাদ শব্দ গ্রহণ করে নিলেও বাংলা ব্যাকরণের বহু পরিভাষাকে নির্দিষ্টভাবে ও একক শব্দে নিতে পারেনি। যেমন ইংরেজির 'কপুলা' (Copula) এবং 'to be' ও কাল বাচক 'Auxiliary' বা সহায়ক ক্রিয়ারূপসমূহ), বাংলার 'অব্যয়' (ইংরেজিতে যা be verb, Adverb, Adverb of place, Peripheral Adverb, Post positions, Prepositions, Conjunctions, Interjections, Coordinates, Correlatives, Cumulatives, Alternatives, Appositions, Onomatopoetics ইত্যাদি।) প্রতিশব্দের এই বহুলতার কারণ এই বিদেশি ভাষায় তার স্বরূপ-বৈচিত্র্য বা প্রয়োগ ভিন্নতার স্বারূপ্য। এইরূপ আরও উদাহরণের মধ্যে, প্রত্যয় (ইংরেজিতে Participles) অনেকটাই তার পরিপূরক। যেমন Past Participles, ক্রিয়া বাচক বিশেষণ অর্থে Participial Adjectives, ভাব-বিশেষ্য অর্থে Gerund প্রভৃতি উল্লেখ্য ।

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরে কিছু বলা যাবে, এখানে সাধারণভাবে শুধু এটুকু বলা যাক যে, এই ভাষা যেমন সংস্কৃতের 'দুহিতা', এবং এই কারণে তার শোষণ ক্ষমতা অনেক; আর তাই প্রতিবেশী বহু ভাষারও উত্তমর্ণ। 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে' প্রতিবেশী ভাষার সাথে তার সম্বন্ধের প্রকৃতি এইরূপ। সাঁওতাল, মুণ্ডারি প্রভৃতি মুণ্ডাভাষার সাথে তার আদানপ্রদানের রূপটা তাই একমুখী নয়। (দ্র. *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ঢাকা ১৯৬৫ : পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

৫.৪

ভাষাভাবনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলা বিভাগের অবদান প্রথমাবধি। বাংলাভাষার প্রথম নমুনা আবিষ্কার ও এ বিষয়ে পূর্বাপর গবেষণা তার উদাহরণ। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ ও আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সাক্ষ্য। বাংলা বিভাগ থেকে বিগত ২০২০-২০২১ সালে বিভাগের দুই স্মরণীয় শিক্ষক, প্রথম বিভাগ-প্রধান ও চর্যাপদ-আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বহুভাষী জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র স্মরণে 'স্মারক বক্তৃতা' ও মুহম্মদ আবদুল হাই-এর জন্মশতবর্ষে ভাষা ও সাহিত্য-সেমিনারের আয়োজন করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিল। এছাড়াও বিগত লিপ ইয়ারে ভাষাশিক্ষণ ও ভাষা-উন্নয়ন বিষয়ে আধুনিক ভাষা-ইন্সটিটিউট আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেও একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল; বাংলা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে এগুলিকে মাইলস্টোন হিসাবে ধরা যায়।

ছয়

ভাষা-পরিবর্তন

৬.০ ভাষার কাঠামো ও ভিন্নতা

ভাষার উপাদানে ও উপাদান ব্যবহারের নিয়মে পরিবর্তন (যেমন পদসংস্থানে অনিয়ম ঘটলে) ভাষার পরিবর্তন ঘটে। কেবল উপাদানের বিকল্প ঘটলেই ভাষা ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে না। যেমন, ভাষার মৌল কাঠামো SOV থেকে SVO, অথবা SOV~SVO থেকে SVO ~ OVS হয়ে পড়লে ভাষার ব্যাকরণে অভিঘাত ঘটবে। উদাহরণ হিসাবে দেখানো যাক : 'আমি বাড়ি যাব' বাক্যটি শুদ্ধ নিয়মে বাংলা। কিন্তু ভিন্ন ভাষার যেমন ইংরেজি নিয়মে শুদ্ধ হলেও 'আমি যাই বাড়ি' (SVO নিয়মে) বাংলায় অশুদ্ধ। আগে তা দেখানো হয়েছে। ভারতীয় সকল আর্য-ভাষারই নিয়ম এটা। কিছু যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। যেমন কাশ্মিরি, অসমিয়া প্রভৃতি দুএকটি ভাষার নিয়ম সামান্য ভিন্ন। কেন এই ভিন্নতার সৃষ্টি হয় উপরে তা বলা হয়েছে।

৬.১ ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ

ধ্বনিতত্ত্বে (ও/উ : লোক/লুক, লোল/লুল; এই ভাবে-লুআ, মুজা; উ স্থলে ০ : রাতুল-রাউল >: লাল; ল স্থলে ন এবং র স্থলে ল = হাতের নোয়া, লাল; লাইপুরা (রায়পুরা); শরিল (শরীর); র,ল লোপে=শইল, ফাগুন; লোপান্ত সম্প্রসার বা বিস্তার: -ক-/-হ-=কাকা/ কাহা; হ/০= হাত/আত, লোহা/ লুআ, নোয়া)। দীর্ঘব্যঞ্জন বা দ্বিত্বধ্বনির গঠন : বাক্কা, পাক্কা, সক্কাল,জব্বর ইত্যাদি। বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন/লোপ : মহাপ্রাণতা লোপ (ঘ,ঝ,ঢ,ধ,ভ>গ,জ,ড,দ,ব), ঘোষিভবন গ> ঘ ইঃ। উদাহরণ : (আঘুন>আগুন; ঝাঁটা>জাডা; ধাই>দাই; ভাত>বাত; এবং অঘোষিভবন : (ব>প) =(বোঝা>পু'জা, এইভাবে কপাট, অপসর ইঃ); ব্যঞ্জন লোপ : ঘ,ত,প > -০- = আঘুন/আগুন> আউন(মাস; বাতুল> বাউল,বপন>বোনা। আগম ধ্বনি : যাআ> যাওয়া, যা(ই) য়া।ইত্যাদি। এছাড়া রূপ-ধ্বনিতত্ত্বে সম্প্রসার বা বিস্ফোরণে ইঁদুর> নিনুর,আমি>হামি, এইভাবে শাহান; সকারিভবন : নাচ>নাস, গাছ>গাস; নাসিক্যীভবন : সন্ধ্যা/সেঞঝা> সাঁজবেলা, হাইঁঞ্জালা ; বিনাসিক্যভবন : মেড়া >ভেড়া-ভেরা, বাঁশ> বাশ; বিপর্যাস : রিসকা, শিক্ষা>শিখকা, ফাল(<লাফ), জালু>জাউলা, সমীভবন : বদ+জাত(জাদ)> বজ্জাত প্রভৃতি।

ধ্বনিসংগঠনে 'স্বাধীন বিকার' (ফ্রি-ভেরিয়েশন)ও একটি সাধারণ ও নিয়মিত রূপ। অবস্থান ও পরিবেশ ভেদে তা মূলধ্বনির বর্ধক বা সম্পূরক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নেই।

জোন্স ভারতীয় ভাষাকে 'stressless' অর্থাৎ ভাষায় শব্দে ঝোঁকবিহীনতার কথা বলেছেন (ওপরে বলা হয়েছে)। ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই দেখিয়েছেন বাংলা ভাষার শব্দে ধ্বনির প্রকাশ দুই রকমের,- stress (শ্বাসাঘাত) এবং pitch (স্বরধ্বনির

টান ও অন্যান্য উচ্চারণ প্রক্রিয়া)। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে জর্মন, ডাচ, ইংরেজি প্রভৃতির মূল যে টিউটোনিক ভাষা এবং ইন্দো-ভারতীয় শাখার সংস্কৃতেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য Accent, কিন্তু বাংলায় তা অর্থভেদক নয়। সমাস, ক্রিয়া বিশেষণে যুক্ত প্রত্যয়াদির কারণে এই ঝোঁকের স্থান পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র আলোচনা দেখা যেতে পারে। (*বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ১৯৬৫ : স্বরাঘাত, দশম পরিচ্ছেদ)

৬.২ রূপ (পদানু) ও সহগঠন

রূপতত্ত্বে, বিশেষত সর্বনামে প্রসারণ, বিপর্যয় ই: (কি স্থলে কিবা/কিবে, সে স্থলে স্যায় বা হ্যায়, তাহারা অর্থে 'হেতারা' ই:); ক্রিয়ার ক্ষেত্রে (এসো স্থলে আহ$^{(অ)}$, কথাবলি স্থলে কই্, খেয়েছ = খাইছ বা খাইছস এবং (Token /Taboo, প্রশ্নরূপ ও নঞর্থ রূপ:) খাইছে! বনাম খা'-ঐছে?,- ইত্যাদি); কারক চিহ্ন ও অন্যান্য 'grammatical marker'; অন-চিহ্নার্থক অব্যয়ী শব্দের বিকল্প ব্যবহার (সব অর্থে- 'হকল', এখন- 'হবায়')। এগুলি ফ্রি- ভেরিয়েশনের রূপেও ধরা যায়। সাদৃশ্যেও (দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের চরিত্র রামমাণিক্যের সাদৃশ্য চিন্তা নয়) শব্দসৃষ্টি ঘটে যেমন বাউড়ি (<বধূ+টি)-র সাদৃশ্যে হয়েছে ঝিউরি, শাশুড়ি ইত্যাদি। সাদৃশ্য রূপতত্ত্বের ধারণাকে এগিয়ে এনেছে বলা হয়। কিন্তু ধরা যাক 'জাদ+আ', অথবা '+ঈ' প্রত্যয়(পদানু) সাধারণ হলেও সর্বত্র ব্যবহার শুদ্ধতা পায় কি? 'নবাবজাদী' ব্যবহৃত হলেও 'নামজাদা'-র স্ত্রীলিঙ্গ নেই বা এর ব্যবহার নেই, যেমন নেই 'রাজ' বা 'রাজা', 'জমিদার', 'সুলতান' কিংবা 'চাকর'-এর পর 'জাদা' বা জাদীর প্রয়োগ। পদানু ব্যবহারের এই নির্দিষ্টতা বা সীমাবদ্ধতার ব্যাখ্যা রূপতত্ত্বে নেই, তবে সাদৃশ্যতত্ত্বে কিছু বিকল্প অসম্ভব নয়। যেমন 'বজ্জাত'-এর ব্যবহার সাধারণ। এই সাদৃশ্যে 'জমিদারজাত' ইত্যাদি সম্ভবত ব্যবহার ভেদে চলে।

৬.৩ বাক্যগঠনের ও রূপান্তরের সূত্র

বাকপ্রকরণ 'আন্তর্মস্তিষ্ক কার্যকলাপ' বিশেষ। ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক গঠনে যেমন পরিবর্তন সূত্র (অর্থাৎ পরিবর্তন, বর্ধন, নবায়ন কিংবা লোপ (loss / deletion) প্রভৃতি লক্ষ করা যায়, তেমনি বাক্যগঠনেও তার উদাহরণ হতে পারে।

(কয়েকটি উদাহরণ : 'হ্যারে, কোথায় ছিলি?' স্থলে 'কিবে, কই আছিলি?' কিংবা শুধু প্রশ্নবোধক বাক্য 'যাবি?' স্থলে সহায়ক বা Auxiliary উপাদান সহ 'যাইবি নি/নিহি?' প্রভৃতি)।

এই পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রায়শই দ্বিভাষিতার মত আন্তঃ-উপভাষিতার প্রভাব বা মিশ্রণ (যাকে বলা হচ্ছে 'D-labelling') প্রকৃতির হয়ে থাকে। সমাজভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক। কারণ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে ভাষার মান-পরিচয়। যেমন প্রধান-অপ্রধান (major/minor), প্রমিত (কেন্দ্রীয়)/শুদ্ধ-অশুদ্ধ (sub-Language)/

প্রান্তিক (regional, peripheral) প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে ভাষীর ভাষা-অঞ্চল ও সামাজিক পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এর সামান্য আলোচনা দেখুন পরে 'ভাষার প্রসার ও উপভাষার সীমা'(৬.৫নং.) উপ-পরিচ্ছদে।

৬.৪ উপভাষার স্থানান্তরণ (Displaced dialectalism)

ভাষা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা ভাষার প্রকৃতিকে নানা ভাবে বিচার করেছেন। ভাষা বিস্তার লাভ করলেই তার পরিচয়ের ভিন্নতা ঘটে। কিন্তু এই ভিন্নতার পরিচয় যুগে যুগে ভিন্ন হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শতম ও কেন্তুম দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে উপভাষার ধারণা এসেছে, আবার সেই ধারণাও এক থাকেনি। পশ্চিমে উপভাষার যে রূপ বৃটিশ উপনিবেশে বিশেষত বৃটিশ ভারতে সেই রূপের সাথে পার্থক্য অনেক।

বাংলা ভাষার পরিচয় সন্ধান বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি বড় অবদান। কিন্তু অন্যান্য ভাষার মতই এ ক্ষেত্রেও পরিণাম অমীমাংসা। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি মৌখিক প্রাকৃতের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, তাদের নাম শৌরসেনী ও গৌড়ী প্রাকৃত। প্রথমে সিবিলিয়নদের এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতদের প্রভাবে শৌরসেনী প্রাকৃতকেই বাংলাভাষার উৎসরূপে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ বাংলা বহির্বঙ্গের ভাষা, মগধ যার কেন্দ্র।

৬.৫ ভাষার প্রসার ও উপভাষার সীমা

কোনও ভাষাভাষী সমাজে ভাষাব্যবহারে যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য বিবেচিত হয় সেটাই তার আপন শক্তি, মৌল বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্যকে আগে সাধারণ বিবেচনায় এর কোনও ভাষিক মূল্য ধারণা করা হতো না। এক বৈচিত্র্যের সাথে অন্য বৈচিত্র্যের পার্থক্য বিবেচিত না হলে সাধারণত তাকে স্বাধীন বিকার হিসাবে গণ্য করা হয়। উপভাষার বৈচিত্র্যকে এতটা স্বেচ্ছাকৃত বা স্বাধীন ভাবতে পারেননি সমাজভাষাবিদ উইলিয়ম ব্রাইট (১৯৬৬ : Introduction to Sociolinguistics), তিনি বলেন, ভাষাভেদ সামাজিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। সমাজভাষাতত্ত্বের মূল কাজই হচ্ছে 'to show that such variation or diversity is not in fact `free'.' অবশ্য যাহা বায়ান্ন তাহাই তেপ্পান্ন নিয়মে সমাজভাষাবিদদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন 'ফ্রি ভেরিয়েশন' বাদী (ব্রাইট) বনাম 'ইনটারফেরেন্স' বাদী (লা পেজ, ১৯৭৩)। একই ভাষাভাষী হয়েও তাতে একই অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার-ভিন্নতায় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের ভেদ বা আঞ্চলিক ভেদ (সংগে/ সাথে যেমন) নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ঈশ্বর/ খোদা, প্রার্থনা/নামাজ, জল/পানি, মাসি/খালা, ধুতি/লুংগি, রক্ত/খুন, অল্প/থোড়া, লাজ-লজ্জা/ শরম (রাবীন্দ্রিক ব্যবহার সত্ত্বে) প্রভৃতি অজস্র শব্দ সমাজকে চিহ্নিত করায়।

বৈচিত্র্যেই ভাষার প্রসারতা। তাতেই কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রান্তীয় উপভাষার (আঞ্চলিক ও সামাজিক) সৃষ্টি। অর্থাৎ প্রান্ত ও উপপ্রান্তের ভাষা 'কেন্দ্রীয়' ভাষার আকর্ষণক্রমে শক্তি লাভ করে,পরিচিতি পায় অখণ্ডতা ও খণ্ডতায় এবং পরিণামে রাজনৈতিক ও স্থানিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্যমানে ভৌগোলায়ন (ব্যবহারিক সীমা) লাভ করে। ভাষা ভৌগোলিক পরিচিতিতেই স্থিতি পায়। কিন্তু তখন তার রাজনৈতিক সীমাঙ্কনও আবশ্যক হয়।

যে কোনও ভূ-রাজনৈতিক সীমায় ভাষা একই সাথে খণ্ড ও অখণ্ডরূপে বা তার বৈচিত্র্য নিয়েই প্রকাশ লাভ করে। তার রূপ হাজার মাইল ব্যবধানে ইংরেজি বা রোমান্স ভাষাগুলির মত ইউরোপাংশ ও আমেরিকায় দ্বি-ভৌগোলিক পরিচয়ে পৃথক হয়েও হতে পারে। তারা তখনও এক নামেরই ভাষা। স্থানিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়েই তাদের ঐকিক পরিচয়। আবার তেমনি জলন্ধর- লাহোর বা পশ্চিম বাংলা-বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ও সন্নিধি দেশ হয়েও পৃথক বা পৃথকপ্রায়ও হতে পারে।

সাত

৭.১ ভাষার অধিগম্যতার রূপ

চার্লস এফ হকেট জার্মান ভাষার যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে উপভাষার সামীপ্যতা (L-simplex) ও বোধগম্যতা (Intelligibility)-তত্ত্ব নিয়ে পরে আরও কথা উঠেছে। সমস্যা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ একটি আবশ্যক তত্ত্ব হিসাবে গণ্য হওয়ার পর। কারণ এতে পুনর্গঠন বা Comparative Reconstruction(CR)-তত্ত্ব Internal এবং External ভাবে সূত্রায়িত হয়। এরই ফলে আগের মত কেবল বহির্প্রমাণ ও/বা বুৎপত্তিনির্ণায়ন দ্বারা ভাষা-মূল বা উৎপত্তি নির্ণয়করণ প্রয়াসে সীমিত না থেকে External evidence-এর সাহায্যে 'সামীপ্যতা' ও 'বোধগম্যতা' নির্ণয়ের সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তখনই L-complex (দূর-সামীপ্যতা)ও আবশ্যিক উপাদান রূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। 'দূরধিগম্যতা' বিষয়ে বলা হয় 'the relative looseness of the terms is a merit, not a defect'. (Hockett) এই দিক থেকে বিচার করেই ডাচ, ফ্লেমিশ প্রভৃতিকে জার্মান ভাষার অন্তর্গত না ভাবার কারণগুলি অন্তর্হিত করা হয়।

কিন্তু হকেট নিজেই আবার প্রশ্ন তোলেন এই সামীপ্যতার সীমা নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন; কোথায় সামীপ্যতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং তার মাত্রাই বা কী তা নিশ্চিত বলা যায় না। সম্ভবত এটাকে আমাদের দৃষ্টিতে এভাবেও দেখতে পারি যদি বলি বঙ্গভাষী অহমিয়া আর অহমি (আসামের) ভাষী বাঙালি দুইয়ের প্রভেদ যেমন আছে, তেমনি অভেদও সামান্য নয়। সুইজারল্যান্ডে বা অস্ট্রিয়ায় জার্মানভাষীরা যেমন। এর কারণ শুধু দীর্ঘসহবাস বা প্রতিবেশিতাই নয়, আপন আপন ভাষা ব্যবহারের সাথে

সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রাধান্য ('প্রমিনেন্স') নির্বাচনও। এখানে হকেট কেবল নিজভাষার ('ইডিওলেক্ট') সচলতা ও সেই সাথে (এক ধরনের) '*Semi-bilingualism*'- প্রক্রিয়াকেও যুক্ত করেছেন। [হকেটের 'ইডিওলেক্ট'-এর স্থলে 'ইডিওসিনক্রেটিক ফিচার' বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়; তাতে পরিস্থিতিকে অধিক স্পষ্ট বোঝা যেতে পারে।]

৭.২ আঞ্চলিক ভাষার স্থান

দক্ষিণ এশিয়ার আশেপাশের দেশের মত বাংলাদেশেও ৪টি আন্তর্জাতিক ভাষা পরিবার লক্ষ করা যায়। এগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় (ভারতীয় আর্য), ভোট-চীনি (তিব্বতি-বর্মি), অস্ট্রালেশিয়া বা অস্ট্রোএশিয়াটিক (মুণ্ডা, সাঁওতালি, সাদরি/ সাতার) এবং দ্রাবিড়ীয়। ভারতের সংবিধানে হিন্দি ও ইংরেজি বাদে যে ১৫টি সিডিউল ভাষার উল্লেখ আছে। কিন্তু সিন্ধির যেমন কোনও রাজ্য নেই, উর্দু, সৌরা (সৌরাষ্ট্রীয়) ও অস্ট্রালেশিয়ান অনেক ভাষাই একাধিক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হয়েও তাদের তেমন স্বীকৃতি নেই; মিশ্রণের মধ্য দিয়েও আবার কিছু ভাষা 'হরণে'র তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের ওঁরাও ও মালতো, ময়মনসিংহের হাজং, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা সীমান্তের কিছু অনার্যভাষাভাষী (যেমন লোধা) প্রভৃতি তাদের মাতৃভাষা এখন প্রায় হারিয়েই ফেলেছে। এইরূপ 'হরণে'র উদাহরণ শুধু ভারতেই নয়, নেপালেও দৃশ্যমান। হিমালয়ী রাজ্য নেপালও উপমহাদেশীয় চার ভাষাভাষীর দেশ। দক্ষিণ-পূর্বে তরাই অঞ্চলে সাঁওতাল প্রভৃতি কিছু অস্ট্রোয়েশিয়াটিক ভাষা, এবং ঝাংগর (Jhangar) ভাষীদের কিছু দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা ছাড়া ৭৫% সিনো-টিবেটান মানুষ ও ৮০% ইন্দো-ইউরোপীয় (৫২% নেপালি, ৫% মৈথেলি, ৭% ভোজপুরি প্রভৃতি)ভাষাভাষীর জনপদ এই নেপাল রাষ্ট্র। ভোট-চীনি তথা তিব্বতি ভাষার মধ্যে রাই, লিম্বু, তামাং, নেওয়ারি ও অন্যান্য কিছু পাহাড়ি ভাষাভাষী কাঠমুণ্ডুসহ নানাস্থলে বসবাস করে। শিক্ষিত ও বাণিজ্যিক বা টুরিস্টদের এলাকায় ইংরেজিসহ কিছু বিদেশি ভাষার ব্যবহার (আরবি, রুশ, জার্মান প্রভৃতি) একবারে অবহেলার মতোও নয়। সরকারি কাজ প্রায় সবই নাগাল্যান্ডের মত ইংরেজিতেই সম্পন্ন হয়। ৬০ দশকের গোড়া থেকে অবশ্য হিন্দির ওপর জোর দেখা দেয় এবং তাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করারও দাবি ওঠে। শিক্ষার মাধ্যম প্রধানত ইংরেজিই যেহেতু, পাঠ্যবই প্রায় সবই ইংরেজি। শুধু ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত নেপালি পড়ানো হলেও অন্যদিকে আইন বিষয়টি আবার শুধু নেপালিতেই শেখানো হয়। শিক্ষা, প্রশাসন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অবস্থান নিম্নবর্গীয়দের তুল্য।

৭.৩ উপভাষার স্থানান্তরণ (Displaced dialectalism)

বাংলা ভাষার পরিচয় সন্ধান বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি বড় অবদান। কিন্তু অন্যান্য ভাষার মতই এ ক্ষেত্রেও পরিণাম অমীমাংসা। তবে এ ক্ষেত্রে

দুটি মৌখিক প্রাকৃতের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, তাদের নাম শৌরসেনী ও গৌড়ী প্রাকৃত। প্রথমে সিবিলিয়নদের এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতদের প্রভাবে শৌরসেনী প্রাকৃতকেই বাংলাভাষার উৎসরূপে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ বাংলা বহির্বঙ্গের ভাষা, মগধ যার কেন্দ্র।

৭.৪ ভাষা ও ভাষার বিশ্বায়ন : World Language , Language of power, Other Languages

বিশ্বায়ন কর্পোরেট বাণিজ্যকে যেমন একচ্ছত্র সুবিধা দান করেছে, তেমনি আবার প্রতিদানে প্রায় দেশেই (তৃতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার সাবেক উপনিবেশি অঞ্চল এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের তথা আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপিয় প্রান্তগুলি) এখন সাধারণের মধ্যে ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টিতেও সহায়তা যোগাতে চাইছে। নেপালেও যেমন প্রাইভেট সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ নানা ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতার কারণে সেখানকার শিক্ষা পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও ঘটেছে লক্ষণীয় উন্নতি। বাংলাদেশের অবস্থা-পর্যালোচনাও সেখানে একটি প্রসঙ্গিক বিষয়। আমরা তা পরে লক্ষ করবো।

ডগলাস কিব্বী নামে এক ভাষা গবেষকের মতে ভাষায় থাকে এক ধরনের দ্বৈততা, সেটাকে তিনি বলেন- 'Language power coin' Vs. 'ecological approach'. ভাষার 'বিশ্বায়ন' যেমন এককভাবে প্রধান বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর একটি বা হাতে গোনা দুএকটি মাত্র ভাষার অস্তিত্বের পক্ষপাতী; এবং তেমনি আবার এই ভাষা-করপোরেট মার্কেটের বিস্তারের ফলে হারিয়ে যাওয়া নানা ভাষা-বৈচিত্র্য ও তার প্রাকৃতিক স্বাদের (natural spices) ক্ষতিপূরণেরও অনুঘটক। অভিধান প্রণেতা ওয়েবস্টার প্রথম 'বিশ্বায়নে'র ধারণা দেন 'Universal business culture' অর্থে।

আট

ভাষার ঐতিহাসিক প্রশ্নে

৮.১ ভাষার জন্ম-মিশ্রণ ও মৃত্যু/বিপন্নতা

পৃথিবীর সব ভাষাই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ তার রূপ ভিন্ন ভিন্ন। তবে তা গোত্রবদ্ধ। তাকে বলা হয় ভাষাবংশ। এটা একটা মীমাংসামাত্র। কেননা ভাষা এক-উৎসক (Unigenesis), নাকি বহু-উৎসক অর্থাৎ বাইবেলই শেষ সত্য নাকি ভাষাবিজ্ঞান, তা অমীমাংসিত।

মিশ্র বা অমিশ্র দুইভাবেই ভাষা সজীব থাকে। আবার দুই ভাবেই ভাষা-মৃত্যু (language death/ endangered) ঘটে। উপজাতীয় ধরনের ভাষা বাদে (!) সব ভাষাই মিশ্রণজাত। অমিশ্রভাষা অনুন্নত, বিচ্ছিন্ন ও বিজনান্তিক।

বাংলা ভাষার নাম সংকর ভাষা হিসাবে। আসলে হিন্দি, ইংরেজি প্রভৃতিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিবেশী ও বিদেশি নানা ভাষার নানা সংযোগেই ভাষার উন্নতি ও প্রসার লাভ ঘটে। অসংকর ভাষাই এর ব্যতিক্রম। তাতে ভাষিক বিকাশের কোনও রূপ, তার সংস্কৃতির কোনও রূপবৈচিত্র্য থাকে না।

৮.২ ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের আলোকে

[Relative Reflex(R-R) vs. Linguistic Area (L-A)]:

হকেটীয় তত্ত্বের একটা ত্রুটি বা ফাঁক যা এখানে উল্লেখ্য তা হলো স্থানীয় ভাষাভাষীদের ধারণা ও একাত্মতার মূল্য তাতে ধার্য করা হয়নি। তাই হকেট মনে করতেন যে তাতে উপভাষার প্রত্নরূপ পুনর্গঠন সিদ্ধ হয় না। অবশ্য বর্তমান লেখকের অভিসন্দর্ভে তার অস্বীকৃতি প্রমাণিত। উল্লিখিত অভিসন্দর্ভটি গড়েই উঠেছে উপভাষার (পশ্চিমবাংলার) পুনর্গঠনের লক্ষ্যে (মনিরুজ্জামান ১৯৭৭)। যাইহোক, প্রাচীন তথা সনাতন ধারণার কারণে শৌরসেনী প্রাকৃত ও গৌড় প্রাকৃত-এর পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়নি। উভয়ের সম্পর্ক কতটা নৈকট্যসূচক, কতটা তার বিপরীত, তা অস্পষ্ট থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিসন্দর্ভে (১৯২৬) শৌরসেনীকে মূল গ্রন্থি বা knot রূপে বিচার করেন। এরই ফলে গৌড়ভাষার সাথে সম্পর্কটিকে উল্লেখের বাইরে রেখেছেন। ড. শহীদুল্লাহ্‌র আবিষ্কারকে একটা ঢিলেঢালা ধরনে বিবেচনার চেষ্টা করেছেন। যেভাবে জার্মান-ডাচের সম্পর্ককে গ্রহণ করেছেন ভাষা-জরিপের কর্মকর্তারা। এছাড়াও জার্মান ভাষাভাষী সুইজারল্যান্ড বা আশেপাশের অন্য দেশসমূহের ভাষিক ঐক্যের ভিত্তি যেমন নিজেদের ভাষা (ইডিওলেক্ট)র প্রতি আসক্তি ও আন্তরিকতা, তেমনি তৎসহ কথিত 'দ্বিভাষিতা'ও। (হকেট প্রতিবেশী ভাষায় মিশ্রভাষার কথা না বলে মেশানো উপভাষার একটা বিশেষ ধরনের কথা বলেছেন, যেখানে 'আধা-দ্বিভাষিতা'র ধর্ম বা লক্ষণও গড়ে ওঠা সম্ভব। হকেটের ধারণায় প্রান্তীয়ভাষাসমূহের আন্ত সম্পর্কটি 'রিলেটিভ লুজনেস'-এর প্রকৃতিতেই সম্পর্কিত থাকে। এই জন্য ভাষা বা উপভাষা দুই ভাবেই তাকে ধরা যায়- নৈকট্য ও উপবর্তিতার ধরন অনুযায়ী। (রাশিয়া অঞ্চলে এই রূপটি তার সীমার প্রসার ভাবা হয়, যদি দেখা যায় কোনও ভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিতে তার ব্যবহারিক সীমাও বৃদ্ধি পায়।)

টীকা

Shiboleth

The story behind the word is recorded in the biblical Book of Judges. The word *shibboleth* in ancient Hebrew dialects meant 'ear of grain' (or, some say, 'stream'). Some groups pronounced it with a*sh* sound, but speakers of related dialects pronounced it with an *s*.

In the story, two Semitic tribes, the Ephraimites and the Gileadites, have a great battle. The Gileadites defeat the Ephraimites, and set up a blockade

across the Jordan River to catch the fleeing Ephraimites who were trying to get back to their territory. The sentries asked each person who wanted to cross the river to say the word *shibboleth*. The Ephraimites, who had no *sh* sound in their language, pronounced the word with an *s* and were thereby unmasked as the enemy and slaughtered.

পরিশিষ্ট

প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ নিয়ে সমস্যাটা বিস্তৃত করতে চাই।

বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভারতীয় আর্য শাখার পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃতের গৌড় অঞ্চলের অপভ্রষ্ট রূপ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দণ্ডীর ব্যাকরণ থেকে প্রাকৃত স্তরে 'গৌড়ীভাষা'র অস্তিত্বের কথা জানতে পারেন। পরে তিনি ভাষাটি পুনর্গঠন করেন। প্রাকৃতের পরে অপভ্রংশ এবং তারপরে নব্যভাষা এই নিয়মে তিনি বাংলাভাষার উৎপত্তি স্থির করার চেষ্টা করেন এই ভাষা থেকে। তার পরেও তিনি মধ্যযুগের ভাষা ('আদি মধ্যবাংলা' তথা শ্রী.কৃ.কী.-এর ভাষা প্রভৃতি) নিয়ে আলোচনা করেন। এইভাবে তিনি দূরশৌরসেনী ভাষার আত্মীয়তাকে অস্বীকৃতি জানান। গ্রিয়ারসন, বীমস, হোয়ের্নলের অনুসরণে সুনীতিকুমার শৌরসেনি প্রাকৃতের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহ্-র গৌড়ীয় তত্ত্ব আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু তা বাতিলযোগ্য বলেও কেউ বলতে পারেনি।

মধ্যযুগের ভাষা সম্পর্কিত ড. শহীদুল্লাহ্র কিছু উপ-সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন সুকুমার সেন। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সর্বনামীয় শব্দের ভ্রান্তিনির্দেশকে ড. শহীদুল্লাহ্র একটি অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের পরিচয় বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর 'গৌড়ি প্রাকৃত'-তত্ত্ব মানতে পারেননি। সৈয়দ আলী আহসান সরাসরি 'এই তত্ত্বে ভুল আছে' বলে পশ্চিমবঙ্গীয় পণ্ডিতদের সমর্থন যুগিয়েছেন। ভুলটা কোথায় বা কেন তার কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি কোথাও।

ড.শহীদুল্লাহ্র মূল গবেষণা চর্যাপদের কবিদের স্থান কাল ও ভাষা নিয়ে। তাঁর আলোচনা তিন ভাষায় পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদ পাওয়া যায় না। ড. শহীদুল্লাহ্ তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে সুনীতিকুমারের বহু ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে 'hasty generalisation' জনিত ভ্রান্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলে প্রমাণ করেছেন, কিন্তু ODBL-এর তৃতীয় ও সংশোধিত সংস্করণেও ড. শহীদুল্লাহ্র অন্তত ভাষা-শাখায়নের (নব্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্বী শাখায়ন প্রসঙ্গী) কোনও আলোচনা বা সমালোচনাও দেখা যায় না, যদিও সেখানে সামান্য কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণে 'পুরুষ'-এর স্ত্রীলিঙ্গে 'স্ত্রী'ও নয়, 'মেয়ে'ও নয়; অভিধানে আছে 'নারী'। কিন্তু পুরুষ মানুষ/ মেয়ে মানুষ, পুরুষ লোক/ মেয়ে লোক- এবং বেটা ছেলে/ মেয়ে ছেলে এবং

ছোট ছেলে/ ছোট মেয়ে, এই রূপসমূহে ভুল নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুণ্ডার সাদৃশ্য স্পষ্ট। কারক বিভক্তিতেও তাই। দ্বিস্বর ধ্বনি ও স্বরসঙ্গতির নিয়মেও মুণ্ডা ও মুণ্ডারি প্রকৃতির অনুসরণ দেখা যায়। সবচেয়ে প্রধান বিষয়টি হচ্ছে পদক্রমরীতি, শব্দ দ্বৈতের গঠন ও ব্যবহারবিধি মুণ্ডাভাষারই অনুকৃতিপ্রায়। বাংলা সংখ্যা শব্দ 'কুড়ি' ও নির্দেশকসহ তার ব্যবহার (যেমন দুকুড়ি পাঁচটা), সাধু ক্রিয়ার সাথে প্রথম পুরুষে 'ক' অনুসর্গ ('বসিবেক'), বিশেষণ রূপে ক্রিয়ার ব্যবহার ('চেনা লোক','কষা অংক'), প্রভৃতি।

বাংলা উপভাষার তিনটি ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হয়। প্রথমত গঠনের দিক থেকে তা দ্বি-রীতিক বা দ্বিধারার : শব্দে এবং ব্যবহারে। তাকে বলে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা; দ্বিতীয়ত, প্রসারের দিক থেকে তা মিশ্রণ ধর্মের। একে বলে ঋণায়ন ; তৃতীয়ত, কিছুকাল থেকে বলা হচ্ছে বাংলা ভাষার দুটো রাজধানী; তবে একটি সক্রিয় থাকলেও অন্যটি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রটিকেই বলা হয় শক্তিশালী। এই কারণে কলকাতার মতো ঢাকা কোনো মান ভাষার উৎসস্থল হতে পারছে না।

ক. বাংলাভাষার ক্ষেত্রে সাধু রীতি আশ্রয়ী ভাষাটি সম্পন্নরীতির এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের ভাষা হয়ে উঠলে তা মানভাষা ও মর্যাদক (prestigious) ভাষায় পরিণত হয়। সবুজপত্র-আন্দোলনের পরে এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চলিত ভাষা প্রতিষ্ঠা পেলেও সাধু রীতির অবস্থা পাঠ্যগ্রন্থ ও কোনও কোনও পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এবং আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে পূর্ববৎই থেকে যায় অনেকটা। এর অন্যতম কারণ 'শেষের কবিতা'র পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্যের, বিশেষত গল্পগুচ্ছ এবং অন্য বেশ কিছু সৃষ্টি সহ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ক্লাসিকসসমূহের আদর্শ পাঠ্যগ্রন্থ ও সাধারণ প্রকাশে তার এ যাবৎ উপস্থিতি তথা অনুসৃতি।

এই অবস্থা পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায়। একে বলে Diglossic situation. এই অবস্থায় সৃষ্টিশীল ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যিক সৃজনকর্ম দুর্বল হয়ে পড়লে এবং পাঠকের মনেযোগ হ্রাস পেলে তখন গতানুগতিকতাই প্রবল হয়ে ওঠে। তাতে সাহিত্য একাডেমি এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে তার প্রভাব পড়ে। এজন্য সাহিত্যিক কার্যক্রম ও সম্মাননা এবং পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়নের প্রয়াসে উদ্যোগ বৃদ্ধি এ ক্ষেত্রে জরুরি। তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে তাকে তাল মেলাবার ব্যবস্থাকেও এগিয়ে নিতে হবে।

খ. উপভাষা-মিশ্রণ বা Dialect Lebelling (DL) :

- ভাষার পরিবর্তন হয় সংমিশ্রণের কারণে। ভাষার উন্নয়নেরও কারণ এটাই। স্যসুর-এর শব্দ ধার করে বলা যায় ঐতিকালিক ও সমকালিক (Diachronic & Synchronic) এই উভয় প্রকরণে এর ব্যাখ্যা সম্ভব। DL এর ধারণাকে ধরা হয় আধুনিক। A new Concept.- 'উপভাষা' যেহেতু ভাষা-বৈচিত্র্যেরই রূপ, সংযোগগত কারণে ভাষার বৈচিত্র্যে কালের প্রবাহে ভিন্নভিন্ন প্রবণতাজনিত ধ্বনি বিকার ঘটে, যার ফলে পূর্বরূপের পরিবর্তন সাধিত হয়। ঠিক যেভাবে প্রাচীন শ-ভাষী ইউফ্রাইমিরা তাদের মূল ধারার

বাইরের ভাষাভাষীদের অর্থাৎ এর ব্যাখ্যায় যেমন বলা হয়েছে যে তারা স্বভাষীদের থেকে আলাদা হবার জন্য প্রতিবেশী মোয়াবিয়া, ইসমাইলিয়া এবং লোৎ বংশীয় ('আমানাইট') সাধারণ ভাষাভাষীদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের কথার ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স-ভাষী হয়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে যেমন উত্তর দক্ষিণের মানুষ আশা/ আসা, রাজশাহী/আযসায়ী, শালা/ স্যালা প্রভৃতির মত পার্থক্য করে কথা বলে।

- মিশ্রণ যখন আত্তীকৃত হয়ে পড়ে তখন ব্লুমফিল্ডের ভাষায় তা প্রভাবভেদে মেয়াদিভাবে সন্নিবদ্ধ বা স্থায়ীভাবে সম্যক সংকরতায় (সাঙ্কর্য রূপে) সমীভূত হয়। স্বাধীন বিকার তার প্রাথমিক রূপ হতে পারে।

- একই রকমভাবে বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী ও সমভাষী এলাকার নানা বৈচিত্র্যের সাথে কালের যাত্রার পথে কোনও মাহেন্দ্রক্ষণে সমীভবন বা সমীকরণ (DL) প্রক্রিয়ায় নানাবিধ মিশ্রণের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাংলা উপভাষার বৈচিত্র্য তারই সৃষ্টি।

- উপভাষা কথ্যভাষারই রূপ। আদিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য আর্যভাষীর মৃত্যু সংঘটিত হলে শূদ্রদের প্রভাবে এই কথ্যভাষার প্রচলন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে, 'মূলে ইহা ব্রাত্যদের ভাষা ছিল।' মৌখিক ভাষাই সাহিত্যে প্রমিত রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ তাকে 'প্রাকৃত ভাষা' রূপেও সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সংযোজন :

[ভারতীয় আর্যভাষার প্রসারণের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র]

৩০০০-২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব	:	ইন্দো-হিট্টিক সংযোগ কাল
২৫০০- ২০০০ খ্রিষ্টপূর্ব	:	ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিকাশ কাল
২০০০- ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব	:	ইন্দো-ইরানীয় ভাষার কাল
১৭৫০ -১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব	:	প্রত্ন-ইরানীয় / প্রত্ন-ভারতীয় আর্য ভাষাবিকাশ কাল
১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব- ১ম খ্রিষ্টপূর্ব	:	ঋকবেদাদি চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ/হোমার, আরণ্যক/ (হোসয়ড), উপনিষদ/(পিথাগোরাস), যাস্ক, নিঘন্টু, প্রতিশাখ্য/ (পিথাগোরাস-হেরাক্লিটস- ডেমোক্রিটস-পিন্ডার), শাকল্য, পাণিনি, রামায়ণ-মহাভারত/ (সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল), কাত্যায়ন,/ (ডায়োনিসিয়াস থ্রক্স, সিসেরো,ভারো)/পতঞ্জলি।*

কাল	সংস্কৃত	গ্রিক-লাতিন	জর্মন ও অন্যান্য	বিশিষ্ট অবদান
১ম খ্রিষ্টাব্দ-ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ	কাতন্ত্র, ভরত-কুইন্টিলিয়ান, নাট্যশাস্ত্র, বররুচি, অমরকোষ, জিনেন্দ্র গোষ্ঠী, চন্দ্রগোমিন		প্রিসিয়ান	গ্রিক বাক্যতত্ত্ব, শব্দাভিধান বিষয়ক গ্রন্থ। (নানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি সংকলনসহ)

৭ম-১০ম খ্রিষ্টাব্দ	হর্ষদেব ভর্ত্তৃহরি, ভামন, দুর্গাসিংহ, হরদত্ত	লিঙ্গানুশাসন; শাকট্যায়ন; রোমান্স ভাষাসমূহের আলোচনা; ভাষার উৎপত্তি সন্ধান
১১শ-১৫শ শতাব্দী	ক্ষীরস্বাম (১০৫০খ্রি.), কৈয়ট, হেমচন্দ্র (১০৪০-১১৭২০), ক্রমদীশ্বর, শরণ দেব (দুর্ঘটবৃত্তি) কাশ্যপ (১২০০খ্রি.) ব্যোপদেব (১৩শ শতক) দান্তে আলিঘিয়েরি (১২৬৫-১৩২১) সারস্বত সমাজ (১২৫০-১৪৫০) জৌমর পদ্মনাভ ভট্ট	আবুল ওয়ালিদ মেরওয়ান ইবনে দ্‌যানা কর্তৃক প্রথম হিব্রু ব্যাকরণ রচনা (Hebrew Root theory); জার্মনিক ধ্বনিতত্ত্ব প্রকাশ। দেশীয় /মাতৃভাষার স্তুতি; প্রাচীন আইসল্যান্ডিয় ভাষা সন্ধান; জার্মান, স্পেন; সৌপদ্ম (১৩৭৫খ্রি.),ধাতুবৃত্তি।
১৬শ-১৮শ শতাব্দী	রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) ভট্টজী দীক্ষিত (১৬৩০খ্রি.) কোন্ডা ভট্ট; ফাদার ম্যঅনোয়েল দা আসসুম্পসাঁও (বোকাবুলারিও... ১৭৪৩) হ্যালহেড (ব্যাকরণ ১৭৭৮) ; গিল ক্রইস্ট (ওরিয়েন্টাল লিঙ্গুইস্ট, ১৭৯৮); হেরাসিম লেবেডেফের ব্যাকরণ (প্রকাশ কাল, লন্ডন,১৮০১);	তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (নরমান জি. পোস্টেল); ফিলিপ্পো সাস্সেটি ডাচ ভাষায় ভর্ত্তৃহরি অনুবাদ; ভাষার উৎপত্তি আলোচনা; জোয়ান জসুয়া কেটেল্যারের ওলন্দাজ ভাষায় হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণ (১৭১৫/১৭৪৩); হল্যান্ডের লাইডেনে মিলিয়াস ডেভিডের প্রাচ্যভাষা বিষয়ে লাতিন ভাষায় আলোচনা (১৭৪৩)।*

- এই সময়ের যে সব ভাষাগবেষক ভাষাতত্ত্বকে ভিন্নমুখে এগিয়ে আনেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন : স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪), কোল ব্রুক, এডল্ফ শ্লেগেলে, হামবোল্ডৎ, শ্লেগেল, ফ্রাঞ্জ বপ, প্রমুখ এবং পরবর্তীকালে (১৯ শতক) যেকব গ্রিম, ব্রুগম্যান, ভেরনর, কলিৎজ, দেলব্রুক, শ্রাডার প্রমুখজন ॥ সর্বশেষ সারণীটি সুকুমার সেন-এর *'ভাষার ইতিবৃত্ত'* এবং সত্যরঞ্জন ব্যানার্জির *Essays on Indo-European Linguistics* গ্রন্থের সহায়তায় নির্মিত।

গ্রন্থপঞ্জি

অনিমেষকান্তি পাল, ২০০৯। *বাংলা ভাষা*, পূর্ব পশ্চিম। কলকাতা

অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৪। *ভাষার মৃত্যু*। ১ম সং. ২০১২, কলকাতা

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা

মনিরুজ্জামান, ১৯৭৭। *Controlled Historical Reconstruction based on Five Bengali Dialects*. Ph.D. Diss. CIIL, Mysore, Unpublished

—, ১৯৯৪। *উপভাষা-চর্চার ভূমিকা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

—, ২০১৮। *ভাষা ও সাহিত্য সাধনা*। BPL, Dhaka

—, ২০২০। *পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৯৬৫। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Ethnologue: Languages of the World, SIL, Texas.

Charles F. Hockett, 1958. *A Course in Modern Linguistics*. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi

D. P. Pattanayak & E. Annamalai, Ed. 1983. *To Greater Heights* (Part I & II). CIIL, Mysore

P.B. Pandit, 1972. *India as a Sociolinguistic Area*. U. of Poona.

Peter Ladedoged, 1971. *Preliminaries to Linguistic Phonetics*. The University of Chicago Press, Chicago & London

Satya Ranjan Banerjee, Ed. 1990. *Essays On Indo-European Linguistics*. The Asiatic Society, Calcutta

William Bright, 1990. *Language Variation in South Asia*. OUP, Oxford.